রাজা ও রানী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ : ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬

সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

বিভিন্ন সংকলনের অন্তর্গত

কাব্যগ্রন্থাবলী : আশ্বিন ১৩০৩

কাব্য-গ্রন্থ। নবম ভাগ। তৃতীয় খণ্ড : ১৩১০

রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী : ১৩১১

কাব্যগ্রন্থ। ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯১৫ খৃস্টাব্দ

রবীন্দ্র-রচনাবলী। প্রথম খণ্ড : আশ্বিন ১৩৪৬

পুনর্মুদ্রণ : ১৯২১ খৃস্টাব্দ, ফাল্গুন ১৩৪৭, শ্রাবণ ১৩৫২

আষাঢ় ১৩৫৯

একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক— রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়-রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বতঃ উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা॥

১৩৪৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা-মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল

নাটকের পাত্রগণ

বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
দেবদত্ত	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ
ত্রিবেদী	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
জয়সেন, যুধাজিৎ	রাজ্যের প্রধান নায়ক
মিহিরগুপ্ত	জয়সেনের অমাত্য
চন্দ্রসেন	কাশ্মীরের রাজা
কুমার	কাশ্মীরের যুবরাজ চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র
শংকর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য
অমরুরাজ	ত্রিচূড়ের রাজা
সুমিত্রা	জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগিনী
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
রেবতী	চন্দ্রসেনের মহিষী
ইলা	অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর। প্রাসাদের এক কক্ষ

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত

দেবদত্ত। মহারাজ, এ কী উপদ্রব!

বিক্রমদেব। হয়েছে কী।

দেবদত্ত। আমাকে বরিবে না কি পুরোহিতপদে।
কী দোষ করেছি প্রভো। কবে শুনিয়াছ
হিং ভ অনুস্বার ভ এই পাপমুখে ?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি। আমি পুরোহিত।
শক্তিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
এক বই পিতা নয়, তাঁরি নাম ভুলি—
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।
অঙ্গে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস!

বিক্রমদেব। তাই তো নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্যভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোনো ব্রহ্মণ্য-বালাই।

দেবদত্ত ॥ তুমি চাও
নখদন্তভাঙা এক পোষা পুরোহিত!

বিক্রমদেব ॥ পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন।
একে তো আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বারো মাস, তার পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ— অনুস্বর-বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্বাদ!

দেবদত্ত ॥ শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি
আছেন ত্রিবেদী; অতিশয় সাধুলোক;
সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্মজ্ঞান!

বিক্রমদেব ॥ অতি ভয়ানক! সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ।
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণবিধি,
নাই তার বাধাবিঘ্ন— শুধু বুলি ছোটে
পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিতপ্রত্যয়
অমর পাণিনি। একসঙ্গে নাহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।

দেবদত্ত ॥ আমি পুরোহিত! মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন
যতেক চিক্কণ মাথা; অমঙ্গল স্মরি
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত।

বিক্রমদেব ॥ কেন অমঙ্গলশঙ্কা?

দেবদত্ত ॥ কর্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষহুতাশন—

বিক্রমদেব ॥ রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নত শির পাতি
সহিতে প্রস্তুত আছি— সহে না কেবল
কুলপুরোহিত-আস্ফালন। জান সখা,
দীপ্ত সূর্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে।
দূর করো মিছে তর্ক যত। এসো, করি
কাব্য-আলোচনা। কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবিবাক্য 'নাহিকো বিশ্বাস
রমণীরে'— আর বার বলো শুনি।

দেবদত্ত ॥ শাস্ত্রং—

বিক্রমদেব ॥ রক্ষা করো— ছেড়ে দাও অনুস্বরগুলো।

দেবদত্ত ॥ অনুস্বর অনুনাসিক নহে মহারাজ,
কেবল টংকারমাত্র। হে বীরপুরুষ,
ভয় নাই। ভালো, আমি ভাষায় বলিব।
'যত চিন্তা কর শাস্ত্র চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে ভয় নাহি ছাড়ে,
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে—
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে।'

বিক্রমদেব ॥ বশ নাহি মানে! ধিক স্পর্ধা কবি, তব!

চাহে কে করিতে বশ ? বিদ্রোহী সে জন।
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী।

দেবদত্ত ॥ তা বটে। পুরুষ রবে রমণীর বশে।

বিক্রমদেব ॥ রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে!
বিধির বিধান-সম অজ্ঞেয়— তা ব'লে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে, আশ্রয় কোথায় পাবে।
নদী ধায়, বায়ু বহে, কেমনে কে জানে!
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

দেবদত্ত ॥ বন্যা আনে
সেই নদী ; সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে।

বিক্রমদেব ॥ প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, লই শিরে তুলি—
তাই বলে কোন্ মূর্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে! বদ্ধ নদী, বদ্ধ বায়ু
রোগ-শোক-মৃত্যুর নিদান। হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কী জান তুমি ?

দেবদত্ত ॥ কিছু না রাজন্।
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। তিন সন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ— শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জন করিয়াছি সকল দেবতা,
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।
ভুলেছি মহিম্নস্তব— শিখেছি গাহিতে

নারীর মহিমা। সে বিদ্যাও পুঁথিগত।
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন।

বিক্রমদেব ॥ না না, ভয় নেই সখা, মৌন রহিলাম ;
তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি।

দেবদত্ত ॥ শুন তবে, বলিছেন কবি ভর্তৃহরি—
'নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল—
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল।'

বিক্রমদেব ॥ সেই পুরাতন কথা।

দেবদত্ত ॥ সত্য, পুরাতন।
কী করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা। যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না সুস্থির। আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে,
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে ?

বিক্রমদেব ॥ মিথ্যা অবিশ্বাস।
এ কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা।
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বৎ— তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে চায় মিথ্যা অবিশ্বাসে।—
হেরো ওই আসিছেন মন্ত্রী, স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে। পলায়ন করি।

দেবদত্ত ॥ রানীর রাজত্বে তুমি লও গে আশ্রয়।
ধাও অন্তঃপুরে। অসম্পূর্ণ রাজকার্য
দুয়ার-বাহিরে পড়ে থাক্ ; স্ফীত হোক
যত যায় দিন। তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে ঊর্ধ্বদিকে, দেবতার
বিচার-আসন-পানে।

বিক্রমদেব ॥ একি উপদেশ ?

দেবদত্ত ॥ না রাজন্, প্রলাপবচন! যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয়।

বিক্রমদেবের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী ॥ ছিলেন না মহারাজ ?

দেবদত্ত ॥ করেছেন অন্তর্ধান অন্তঃপুর-পানে।

মন্ত্রী ॥ (বসিয়া পড়িয়া)
হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কী দশা করিলে!
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন!
শ্মশানভূমির মতো বিষণ্ণ বিশাল
রাজ্যের বক্ষের 'পরে সগর্বে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণরুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর!
রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকাররবে!

দেবদত্ত ॥ দেখে হাসি আসে—
রাজা করে পলায়ন, রাজ্য ধায় পিছে!

হল ভালো মন্ত্রিবর, অহর্নিশি যেন
রাজ্যে ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা।

মন্ত্রী॥ একি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণঠাকুর!

দেবদত্ত॥ না হাসিয়া করিব কী? অরণ্যে ক্রন্দন
সে তো বালকের কাজ। দিবস-রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মতো তুষার-কঠিন।
কী ঘটেছে বলো শুনি।

মন্ত্রী॥ জান তো সকলি।
রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
ভাগ করি লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভা মাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
ব'সে ব'সে হাসে। শূন্য সিংহাসন-পাশে
বিদীর্ণহৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে।

দেবদত্ত। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত—
রিক্তহস্ত কর্ণধার উচ্চে একা বসি
বলে 'কর্ণ কোথা গেল'। মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা—
বাহিছে প্রেমের তরী লীলাসরোবরে

বসন্তপবনে। রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক ডুবে অকূল পাথারে।

মন্ত্রী ॥ হেসো না ঠাকুর। ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ।

দেবদত্ত ॥ আমি বলি মন্ত্রিবর,
রাজারে ডিঙায়ে, একেবারে পড়ো গিয়ে
রানীর চরণে।

মন্ত্রী ॥ আমি পারিব না তাহা।
আপন আত্মীয়জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।

দেবদত্ত ॥ শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী! চেন না মানুষ।
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী; পারে না সহিতে
পরের বিচার।

মন্ত্রী ॥ ওই শোনো কোলাহল।

দেবদত্ত ॥ একি প্রজার বিদ্রোহ?

মন্ত্রী ॥ চলো, দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

লোকারণ্য

কিনু নাপিত ॥ ওরে ভাই, কান্নার দিন নয়। অনেক কেঁদেছি, তাতে কিছু হল কি?

মন্মথ চাষা ॥ ঠিক বলেছিস রে। সাহসে সব কাজ হয়— ওই-যে কথায় বলে, 'আছে যার বুকের পাটা, যমরাজকে সে দেখায় ঝাঁটা।'

কুঞ্জরলাল কামার ॥ ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুঠ করব।

কিনু নাপিত ॥ ভিক্ষেং নৈব নৈবচ। কী বলো খুড়ো, তুমি তো খাস ব্রাহ্মণের ছেলে, লুটপাটে দোষ আছে কি?

নন্দলাল ॥ কিছু না, খিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা। জানিস তো অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

অনেকে ॥ আগুন! তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাকো ঠাকুর। তবে তাই হবে। তা, আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে, আগুনে পাপ নেই রে। এবার ওদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চরাব।

কুঞ্জর ॥ আমার তিনটে সড়কি আছে।

মন্মথ ॥ আমার একগাছা লাঙল আছে; এবার রাজপুরা মাথাগুলো মাটির ঢেলার মত চষে ফেলব।

শ্রীহর কলু ॥ আমার একগাছ বড়ো মুগুর আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

হরিদীন কুমোর ॥ ওরে, তোরা মরতে বসেছিস নাকি? বলিস কী রে?

আগে রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।

কিনু নাপিত ॥ আমিও তো সেই কথা বলি।

কুঞ্জর ॥ আমিও তো তাই ঠাওরাচ্ছি।

শ্রীহর ॥ আমি বরাবর বলে আসছি, ঐ কায়স্থর পোকে বলতে দাও। আচ্ছা, দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না?

মনসুরাম কায়স্থ ॥ ভয় আমি কাউকে করি নে। তোরা লুঠ করতে যাচ্ছিস, আর আমি দুটো কথা বলতে পারি নে?

মন্মথ ॥ দাঙ্গা করা এক আর কথা বলা এক। এই তো বরাবর দেখে আসছি— হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।

কিনু ॥ মুখের কোনো কাজটাই হয় না— অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না।

কুঞ্জর ॥ আচ্ছা, তুমি কী বলবে বলো।

মনসুরাম ॥ আমি ভয় করে বলব না; আমি প্রথমেই শাস্ত্র বলব।

শ্রীহর ॥ বল কী? তোমার শাস্তর জানা আছে? আমি তো তাই গোড়াগুড়িই বলছিলুম, কায়স্থর পোকে বলতে দাও, ও জানে-শোনে।

মনসুরাম ॥ আমি প্রথমেই বলব—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ ॥

হরিদীন ॥ হাঁ, এ শাস্ত্র বটে।

কিনু ॥ (ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো, তুমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কিনা? তুমি তো এ সমস্তই বোঝ?

নন্দ ॥ হাঁ—তা—ইয়ে—ওর নাম কী— তা, বুঝি বৈকি। কিন্তু, রাজা যদি না বোঝে, তুমি কী করে বুঝিয়ে দেবে বলো তো শুনি।

মনমুরাম। অর্থাৎ, বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

জওহর তাঁতি। ঐ অত বড়ো কথাটার এইটুকু মানে হল?

শ্রীহর। তা না হলে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ। চাষাভুষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট, বড়োলোকের মুখে সেইটেই কত বড়ো শোনায়!

মনমুখ। কিন্তু কথাটা ভালো, 'বাড়াবাড়ি কিছু নয়'। শুনে রাজার চোখ ফুটবে।

জওহর। কিন্তু, ঐ একটাতে হবে না, আরও শাস্তর চাই!

মনমুরাম। তা, আমার পুঁজি আছে, আমি বলব—

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ॥

তা, আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না— ঐটে ভালো নয়।

হরিদীন। এ ভালো কথা, মস্ত কথা, ঐযে কী বললে— ও কথাগুলো শোনাচ্ছে ভালো।

শ্রীহর। কিন্তু, কেবল শাস্তর বললে তো চলবে না— আমার ঘানির কথাটা কখন আসবে? অমনি ঐ সঙ্গে জুড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা, তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে? একি তোমার গোরু পেয়েছ?

জওহর। কলুর ছেলে, ওর আর কত বুদ্ধি হবে!

কুঞ্জর। দু ঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু, আমার কথাটা কখন পাড়বে? মনে থাকবে তো? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল নয়। সে আমার ভাইপো, সে বুধকোটে থাকে— সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন ॥ সব বুঝলুম, কিন্তু যেরকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে ?

কুঞ্জর ॥ তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিনু ॥ শাবাশ বলেছ, শাস্তর ছেড়ে অস্তর।

মনসুখ ॥ কে বললে হে ? কথাটা কে বললে ?

কুঞ্জর ॥ (সগর্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিনু ॥ তা, ঠিক বলেছ ভাই— শাস্তর আর অস্তর— কখনো শাস্তর কখনো অস্তর— আবার, কখনো অস্তর কখনো শাস্তর।

জগহর ॥ কিন্তু, বড়ো গোলমাল হচ্ছে। কথাটা কী যে স্থির হল বুঝতে পারছি নে। শাস্তর না অস্তর ?

শ্রীহর ॥ বেটা তাঁতি কিনা, এইটে আর বুঝতে পারলি নে! তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কী! স্থির হল যে শাস্তরের মহিমা বুঝতে ঢের দেরি হয়, কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্‌পট্‌ বোঝা যায়।

অনেকে ॥ (উচ্চস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক— অস্তর ধরো।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ॥ বেশি ব্যস্ত হবার দরকার করে না। চুলোতেই যাবে শিগ্‌গির। তার আয়োজন হচ্ছে। বেটা, তোরা কী বলছিলি রে ?

শ্রীহর ॥ আমরা ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শুনছিলুম ঠাকুর।

দেবদত্ত ॥ এমনি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে! যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কিনু ॥ তোমার কী ঠাকুর। তুমি তো রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে

ফুলছ— আমাদের পেটেনাড়ী গুলো জলে জলে ম'ল— আমরা কি বড়ো সুখে চেঁচাচ্ছি!

মনসুখ॥ আজকালের দিনে আস্তে বললে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর॥ কান্নাকাটি ঢের হয়েছে, এখন দেখছি অন্য উপায় আছে কিনা।

দেবদত্ত॥ কী বলিস রে! তোদের বড় আস্পর্ধা হয়েছে! তবে শুনবি? তবে বলব?—

ন সমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।

ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

হরিদীন॥ ও বাবা, শাপ দিচ্ছে নাকি?

দেবদত্ত॥ (মনসুখ প্রতি) তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি তো শাস্তর বোঝ— কেমন, এ ঠিক কথা কিনা? নস মানস মানস মানসং।

মনসুরাম। আজ্ঞা, ঠিক। শাস্ত্র যদি চাও তো এই বটে। তা, আমিও তো ঠিক ঐ কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম।

দেবদত্ত॥ (নন্দর প্রতি) নমস্কার। তুমি তো ব্রাহ্মণ দেখছি। কী বল ঠাকুর, পরিণামে এই সব মূর্খরা 'ভ্রমদভ্রমদভ্রমং' হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলছি, কিন্তু বোঝে কে! ছোটোলোক কিনা!

দেবদত্ত॥ (মনসুখের প্রতি) তোমাকে এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মতো দেখাচ্ছে। আচ্ছা, তুমিই বলো দেখি— কথাগুলো কি ভালো হচ্ছিল?

(কুঞ্জরের প্রতি) আর, তোমাকেও তো বেশ ভালো মানুষ দেখছি হে, তোমার নাম কী?

কুঞ্জর॥ আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপোর নাম।

দেবদত্ত॥ ওঃ! তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা, আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন ॥ আর, আমাদের কী হবে?

দেবদত্ত ॥ তা আমি বলতে পারি নে বাপু। এখন তো তোরা কান্না ধরেছিস, এই একটু আগে আর-এক সুর বের করেছিলি। সে কথাগুলো কি রাজা শোনে নি? রাজা সব শুনতে পায়।

অনেকে ॥ দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছু বলি নি, ঐ কাঞ্জুলাল না মাঞ্জুলাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর ॥ চুপ কর্। আমার নাম খারাপ করিস নে— আমার নাম কুঞ্জরলাল। তা, মিছে কথা বলব না, আমি বলছিলুম, 'যেমন শাস্তর আছে তেমনি অস্তরও আছে। রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে, তখন অস্তর আছে।' কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেবদত্ত ॥ ঠিক বলেছ, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। অস্ত্র কী? না, বল। তা, তোমাদের বল কী? না, 'দুর্বলস্য বলং রাজা'। কিনা, রাজাই দুর্বলের বল। আবার, 'বালানাং রোদনং বলং'। রাজার কাছে তোমরা বালক বৈ নও। অতএব এখানে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র। শাস্তর যদি না খাটে তো তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না। বড়ো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ— প্রথমে আমাকেই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখতে হবে। কী হে, তোমার নাম কী?

কুঞ্জর ॥ আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

অন্য সকলে ॥ ঠাকুর, আমাদের মাপ করো, ঠাকুর, মাপ করো—

দেবদত্ত ॥ আমি মাপ করবার কে! তবে দেখ্, কান্নাকাটি করে দেখ্, রাজা যদি মাপ করে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর। প্রমোদকানন

বিক্রমদেব ও সুমিত্রা

বিক্রমদেব॥ মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন-মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম— সম্মুখে গভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে; দিবালোকতট হতে
এসো, নেমে এসো, কনকচরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথসাগরে।—
কোথা ছিলে প্রিয়ে?

সুমিত্রা॥ নিতান্ত তোমারি আমি,
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহকাজে, জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রমদেব: থাক্ গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি।
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।

সুমিত্রা ॥ কেবল অন্তরে তব! নহে নাথ, নহে—
রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।

বিক্রমদেব ॥ হায় প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
সে সুখের দিন। সেই প্রথম মিলন—
প্রথম প্রেমের ছটা; দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবনবিকাশ;
সেই নিশিসমাগমে দুরুদুরু হিয়া,
নয়নপল্লবে লজ্জা, ফুলদলপ্রান্তে
শিশিরবিন্দুর মতো, অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়,
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতর কম্পিত
দীপশিখাসম; নয়নে নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি; বেধে যায় হৃদয়ের
কথা; হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে, চাহে
নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা-পাশে;
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন;
তিলেক বিচ্ছেদ-লাগি কাতর হৃদয়!
কোথা ছিল গৃহকাজ? কোথা ছিল প্রিয়ে,
সংসারভাবনা?

সুমিত্রা ॥ তখন ছিলাম শুধু
ছোটো দুটি বালক বালিকা; আজি মোরা
রাজা রানী।

বিক্রমদেব ॥ রাজা রানী! কে রাজা? কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

সুমিত্রা ॥ শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,
একি ভালোবাসা! এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী— আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ,
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।

বিক্রমদেব ॥ চাহ না আমার প্রেম!

সুমিত্রা ॥ কিছু চাই নাথ,
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রমদেব ॥ আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা ॥ তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার 'পরে,
স্বতন্ত্র, উন্নত; তবে তো আশ্রয় পাব
আমরা লতার মতো তোমাদের শাখে।
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালোবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার?

তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত;
সহস্র পাখির গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।

বিক্রমদেব ॥ কথা দূর করো প্রিয়ে! হেরো সন্ধ্যাবেলা
মৌনপ্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি। তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষন!
অধর অধরে বসি প্রহরীর মতো
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী ॥ এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রীমহাশয়—
গুরুতর রাজকার্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রমদেব ॥ ধিক্ তুমি! ধিক্ মন্ত্রী! ধিক্ রাজকার্য!
রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে!

কঞ্চুকীর প্রস্থান

সুমিত্রা ॥ যাও নাথ, যাও!

বিক্রমদেব ॥ বার বার এক কথা!
নির্মম! নিষ্ঠুর! কাজ কাজ, যাও যাও!
যেতে কি পারি নে আমি? কে চাহে থাকিতে?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার

সযত্নে-ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা?
এখনি চলিনু।

অয়ি হৃদিলগ্না লতা!

ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ। মোছো আঁখি—
ম্লান মুখে হাসি আনো, অথবা ভ্রূকুটি।
দাও শাস্তি, করো তিরস্কার।

সুমিত্রা॥ মহারাজ,

এখন সময় নয়— আসিয়ো না কাছে—
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রমদেব॥ হায় নারী, কী কঠিন হৃদয় তোমার।
কোনো কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য চলিছে অবাধে। এ কেবল
সামান্য কী বিঘ্ন নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান।

সুমিত্রা॥ ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি— সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন
নোস তোরা কেহ, আমি আছি— আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ

সুমিত্রা

সুমিত্রা ॥ এখনো এল না কেন! কোথায় ব্রাহ্মণ!
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ॥ জয় হোক।

সুমিত্রা ॥ ঠাকুর, কিসের কোলাহল?

দেবদত্ত ॥ শোন কেন মাতঃ? শুনিলেই কোলাহল।
সুখে থাকো, রুদ্ধ করো কান। অন্তঃপুরে,
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল তো এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল।

সুমিত্রা ॥ বলো শীঘ্র কী হয়েছে।

দেবদত্ত ॥ কিছু না, কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।

সুমিত্রা ॥ আহা, কে ক্ষুধিত?

দেবদত্ত। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য।

সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কী শুনি!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেবদত্ত। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুকুরের মতো লোলজিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে; পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

সুমিত্রা। কী বলিলে,
রাজা কি নির্দয় তবে! দেশ অরাজক।

দেবদত্ত। অরাজক কে বলিবে! সহস্ররাজক!

সুমিত্রা। রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?

দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই সে কী কথা! বিলক্ষণ আছে!
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি।
তাদের কী দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?

সুমিত্রা ॥ বিদেশী ? কে তারা ? তবে, আমার আত্মীয় ?

দেবদত্ত ॥ রানীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি।

সুমিত্রা ॥ জয়সেন ?

দেবদত্ত ॥ ব্যস্ত তিনি প্রজা-সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে— আছে শুধু অস্থি আর চর্ম।

সুমিত্রা ॥ শিলাদিত্য ?

দেবদত্ত ॥ তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।

সুমিত্রা ॥ যুধাজিৎ ?

দেবদত্ত ॥ নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
'বাপু বাছা', আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে—
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

সুমিত্রা ॥ এ কী লজ্জা! এ কী পাপ! আমার আত্মীয়!
পিতৃকুল-অপযশ! ছি ছি, এ কলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দেবদত্তের গৃহ

নারায়ণী গৃহকার্যে নিযুক্ত

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ॥ প্রিয়ে, বলি ঘরে কিছু আছে কি?

নারায়ণী ॥ তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাকলেই আপদ চোকে।

দেবদত্ত ॥ ও আবার কী কথা!

নারায়ণী ॥ তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক জুটিয়ে আন, ঘরে খুদকুঁড়ো আর বাকি রইল না। খেটে খেটে শরীরও আর থাকে না।

দেবদত্ত। আমি সাধে আনি? হাতে কাজ থাকলে তুমি থাক ভালো, সুতরাং আমিও ভালো থাকি। আর কিছু না হোক, তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে।

নারায়ণী ॥ বটে! তা, আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জানত! তা, কে বলে আমার কথা শুনতে—

দেবদত্ত। তুমিই বল, আবার কে বলবে? এক কথা না শুনলে দশ কথা শুনিয়ে দাও।

নারায়ণী ॥ বটে! আমি দশ কথা শোনাই! তা, আমি এই চুপ করলুম। আমি একেবারে থামলেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সে দিন আছে— সে দিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুনতে সাধ গিয়েছে — এখন আমার কথা পুরোনো হয়ে গেছে।

দেবদত্ত ॥ বাপ রে! আবার নতুন মুখের নতুন কথা! শুনলে আতঙ্ক হয়। তবু পুরোনো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।

নারায়ণী ॥ আচ্ছা, বেশ! এত জ্বালাতন হয়ে থাক তো আমি এই চুপ করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বললেই হত। আমি তো জানতুম না। জানলে কে তোমাকে—

দেবদত্ত ॥ আগে বলি নি! কতবার বলেছি। কই, কিছু হল না তো।

নারায়ণী ॥ বটে! তা বেশ, আজ থেকে এই চুপ করলুম। তুমিও সুখে থাকবে, আমিও সুখে থাকব। আমি সাধে বকি? তোমার রকম দেখে—

দেবদত্ত ॥ এই বুঝি তোমার চুপ করা?

নারায়ণী ॥ আচ্ছা। (বিমুখ)

দেবদত্ত ॥ প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধুরভাষিণী! কোকিলগঞ্জিনী!

নারায়ণী ॥ চুপ করো।

দেবদত্ত ॥ রাগ কোরো না প্রিয়ে— কোকিলের মতো রঙ বলছি নে, কোকিলের মতো পঞ্চমস্বর।

নারায়ণী ॥ যাও যাও, বোকো না। কিন্তু, তা বলছি, তুমি যদি আরো ভিখিরি জুটিয়ে আন তা হলে হয় তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত ॥ তা হলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব, এবং ভিক্ষুক-গুলোও যাবে।

নারায়ণী ॥ মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।

নারায়ণীর প্রস্থান

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ

ত্রিবেদী ॥ শিব শিব শিব! তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ?

দেবদত্ত ॥ তা হয়েছি। কিন্তু, রাগ কেন ঠাকুর? কোনো দোষ ছিল না। মালাও জপি নে, ভগবানের নামও করি নে। রান্নার মজি।

ত্রিবেদী ॥ পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি!

দেবদত্ত ॥ আমার উপর রাগ করে শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষচ্ছেদ নয়, পক্ষোদ্ভেদ।

ত্রিবেদী ॥ তা, ও একই কথা। ছেদও যা ভেদও তা। কথায় বলে ছেদ-ভেদ। হে ভবকাণ্ডারী! যা হোক, তোমার যতদূর বাবকা হবার তা হয়েছে।

দেবদত্ত ॥ ব্রাহ্মণী সাক্ষী, এখনো আমার যৌবন পেরোয় নি।

ত্রিবেদী ॥ আমিও তাই বলছি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বাবকা হয়েছে। তা, তুমি মরবে। হরি হে দীনবন্ধু!

দেবদত্ত ॥ ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যা হবে না। হাঁ, আমি মরব। কিন্তু, সে জন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন করতে হবে না; স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুটুম্বিতে তা নয়, সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রিবেদী ॥ তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেছে। দয়াময় হরি।

দেবদত্ত ॥ তা কী করে জানব? দেখেছি বটে আজকাল মরে ঢের লোক— কেউ বা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা গলায় কলসি বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে, কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠতে পারি তো রাগ কোরো না ঠাকুর— সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ।

ত্রিবেদী ॥ প্রণিপাত! শিব শিব শিব!

দেবদত্ত ॥ আর কিছু প্রয়োজন আছে?

ত্রিবেদী ॥ না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়! তা, তোমার চালে যদি দু-একটা বেশি কুমড়ো ফলে থাকে তো দিতে পার— আমার দরকার আছে।

দেবদত্ত ॥ এনে দিচ্ছি।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর

পুষ্পোদ্যান

বিক্রমদেব ও রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য

বিক্রমদেব ॥ শুনো না অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ
যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
সুযোগ্য সুজন। একমাত্র অপরাধ
বিদেশী তাহারা— তাই এ রাজ্যের মনে
বিদ্বেষ-অনল উগারিছে কৃষ্ণ ধূম
নিন্দা রাশি-রাশি।

অমাত্য ॥ সহস্র প্রমাণ আছে,
বিচার করিয়া দেখো।

বিক্রমদেব ॥ কী হবে প্রমাণ।
চলিছে বিশাল রাজ্য বিশ্বাসের বলে;
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে। প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজধর্ম। আর্য, যাও ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

অমাত্য ॥ পাঠায়েছে
মন্ত্রী মোরে; সানুনয়ে করিছে প্রার্থনা
দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য-তরে।

বিক্রমদেব ॥ চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য।
সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
দেখা দেয়, অতি ভীরু, অতি সুকুমার;
ফুটে ওঠে পুষ্পটির মতো, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে— কে তারে ভাঙিতে চাহে
অকালে চিন্তার ভারে! বিশ্রামেরে জেনো
কর্তব্য কাজের অঙ্গ।

অমাত্য ॥ যাই মহারাজ।

প্রস্থান

রানীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য ॥ বিচারের আজ্ঞা হোক।

বিক্রমদেব ॥ কিসের বিচার?

অমাত্য ॥ শুনি নাকি মহারাজ, নির্দোষীর নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রমদেব ॥ সত্য হবে! কিন্তু যত ক্ষণ
বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের 'পরে
তত ক্ষণ থাকো মৌন হয়ে। এ বিশ্বাস
ভাঙিবে যখন, তখন আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে।

অমাত্যের প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ হায় কষ্ট মানবজীবন! পদে পদে
নিয়মের বেড়া! আপন রচিত জালে
আপনি জড়িত! অশান্ত আকাঙ্ক্ষাপাখি
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জরপিঞ্জরে!

কেন এ জটিল অধীনতা! কেন এত
আত্মপীড়া! কেন এ কর্তব্য-কারাগার!
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা, বসন্তের
আনন্দমঞ্জরী! শুধু প্রভাতের আলো,
নিশির শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান, বায়ুর হিল্লোল,
স্নিগ্ধ পল্লবশয়ন, প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ-পানে নীরবে উত্থান—
তার পরে ধীরে ধীরে শ্যামদূর্বাদলে
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
নিদ্রিত নিশায় মর্মে সংশয়দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ।

সুমিত্রার প্রবেশ

এসেছ পাষাণী! দয়া হয়েছে কি মনে?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে? জান না কি প্রিয়ে,
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর।
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য।

সুমিত্রা। হায়, ধিক্ মোরে! কেমনে বোঝাব নাথ,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে
মহারাজ, অধীনীর শোনো নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু,

পারি নে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন। রক্ষা করো
পীড়িত প্রজারে।

বিক্রমদেব ॥ কী করিতে চাহ রানী ?

সুমিত্রা ॥ আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের।

বিক্রমদেব ॥ কে তাহারা জান ?

সুমিত্রা ॥ জানি।

বিক্রমদেব ॥ তোমার আত্মীয়।

সুমিত্রা ॥ নহে মহারাজ। আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়। এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন-
রাজছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে, তারা দস্যু, তারা চোর।

বিক্রমদেব ॥ যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা।

সুমিত্রা ॥ এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে।

বিক্রমদেব ॥ আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবে না এক পদ।

সুমিত্রা ॥ তবে যুদ্ধ করো।

বিক্রমদেব ॥ যুদ্ধ করো! হায় নারী, তুমি কি রমণী!
ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু, তার আগে
তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা।
ধর্মাধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ

সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ— তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে।
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যত দিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট-সম রব তব সাথে।

সুমিত্রা ॥ আজ্ঞা করো মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ এমনি করেই মোরে করেছ বিকল।
আছ তুমি আপনার মহত্বশিখরে
বসি একাকিনী; আমি পাই নে তোমারে।
দিবানিশি চাহি তাই। তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া। হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন!

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ॥ জয় হোক মহারানী— কোথা মহারানী,
একা তুমি মহারাজ?

বিক্রমদেব ॥ তুমি কেন হেথা?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুর-মাঝে?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ?

দেবদত্ত ॥ রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
উর্ধ্বস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে— সে কি ভাবে কভু

পাছে তব বিশ্রামের হয় কোনো ক্ষতি ?—
ভয় নাই মহারাজ, এসেছি কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রানীমার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়ই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ সুখী হোক, সুখে থাক্ এ রাজ্যের সবে!
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন!
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ সকল! কেন মানুষের 'পরে
মানুষের এত উপদ্রব! দুর্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার 'পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন! যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়।

সপ্তম দৃশ্য

মন্ত্রগৃহ

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী

বিক্রমদেব ॥ এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে। সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন!
আর যেন একদিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল।

মন্ত্রী ॥ মহারাজ, ধৈর্য চাই। কিছু দিন ধরে
রাজার নিয়ত দৃষ্টি পড়ুক সবার,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।
অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে
অমঙ্গল— এক দিনে কী করিবে তার!

বিক্রমদেব ॥ এক দিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে।
শত বরষের শাল যেমন সবলে
এক দিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।

মন্ত্রী ॥ অস্ত্র চাই, লোক চাই—

বিক্রমদেব ॥ সেনাপতি কোথা?

মন্ত্রী ॥ সেনাপতি নিজেই বিদেশী।

বিক্রমদেব ॥ বিড়ম্বনা!
তবে ডেকে নিয়ে এসো দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ করো মুখ,

অর্থ দিয়ে করহ বিদায়। রাজ্য ছেড়ে
যাক চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা।

প্রস্থান

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা ॥ আমি এ রাজ্যের রানী— তুমি মন্ত্রী বুঝি ?

মন্ত্রী ॥ প্রণাম জননী। দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন!

সুমিত্রা ॥ প্রজার ক্রন্দন শুনে পারি নে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার।

মন্ত্রী ॥ কী আদেশ মাতঃ ?

সুমিত্রা ॥ বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।

মন্ত্রী ॥ সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে, কেহ আসিবে না।

সুমিত্রা ॥ মানিবে না রানীর আদেশ ?

দেবদত্ত ॥ রাজা রানী
ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায়।

সুমিত্রা ॥ কালভৈরবের পূজোৎসবে
করো নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে।
গর্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত।

প্রস্থান

দেবদত্ত। কাহারে পাঠাবে দূত?

মন্ত্রী। ত্রিবেদীঠাকুরে।

নির্বোধ সরলমন ধার্মিক ব্রাহ্মণ,

তার 'পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।

দেবদত্ত। ত্রিবেদী সরল! নির্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার,

সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

অষ্টম দৃশ্য

ত্রিবেদীর কুটির

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী

মন্ত্রী ॥ বুঝেছ ঠাকুর? এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রিবেদী ॥ তা বুঝেছি। হরি হে! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৈরহিত্যের বেলায় দেবদত্তর খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী ॥ তুমি তো জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর তো কোনো কাজ হয় না। উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

ত্রিবেদী ॥ কেন, আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি? আমি বেদ পুজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখবার জো নেই।— আজই আমি যাব। হে মধুসূদন!

মন্ত্রী ॥ কী বলবে?

ত্রিবেদী ॥ তা, আমি বলব, কালভৈরবের পুজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি খুব বড়ো-রকম সালংকার দিয়েই বলব— সব কথা এখন মনে আসছে না, পথে যেতে যেতে ভেবে নেব। হরি হে, তুমিই সত্য!

মন্ত্রী ॥ যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো ঠাকুর।

প্রস্থান

ত্রিবেদী ॥ আমি নির্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গোরু! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝব না, শুধু

লেজে মোড়া খেয়ে চলব, আর সন্ধেবেলায় দুটিখানি শুকনো বিচিলি খেতে দেবে! হরি হে, তোমারই ইচ্ছে। দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে। ওরে, এখনো পুজোর সামগ্রী দিলি নে! বেলা যায় যে। নারায়ণ! নারায়ণ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহগড়। জয়সেনের প্রাসাদ

জয়সেন, ত্রিবেদী ও মিহিরগুপ্ত

ত্রিবেদী ॥ তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তা হলে আমার আপ্তবিস্মৃতি হবে। ভক্তবৎসল হরি! দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে দিয়েছে— কী বলছিলেম ভালো, আমাদের রাজা কাল-ভৈরবের পুজো -নামক একটা উপলক্ষ ক'রে—

জয়সেন ॥ উপলক্ষ ক'রে?

ত্রিবেদী ॥ হাঁ, তা নয় উপলক্ষই হল, তাতে দোষ হয়েছে কী? মধুসূদন! তা, তোমার চিন্তা হতে পারে বটে। উপলক্ষ শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হয়ে পড়েছে, ওর যা যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়সেন ॥ তাই তো ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্ছি।

ত্রিবেদী ॥ রামনাম সত্য! তা, নাহয় উপলক্ষ না ব'লে উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কী বাপু? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষই বল আর উপসর্গই বল অর্থ সমানই রইল।

জয়সেন ॥ তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেছেন তার উপ-লক্ষ এবং উপসর্গ পর্যন্ত বোঝা গেল, কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কী খুলে বলো দেখি।

ত্রিবেদী ॥ ঐটে বলতে পারলুম না বাপু, ঐটে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি। হরি হে!

জয়সেন ॥ ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর তো বিপদে পড়বে।

ত্রিবেদী ॥ হে ভগবান! হা দেখো বাপু, তুমি রাগ কোরো না—তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মতো তা বোধ হচ্ছে না।

জয়সেন ॥ বেশি বোকো না ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেলো।

ত্রিবেদী ॥ বাসুদেব! সকল জিনিসেরই কি যথার্থ কারণ থাকে? যদি বা থাকে তো সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারাই জানে। মন্ত্রী জানে, দেবদত্ত জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবো না, বোধ করি সেখানে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবিলম্বে টের পাবে।

জয়সেন ॥ মন্ত্রী তোমাকে আর কিছুই বলে নি?

ত্রিবেদী ॥ নারায়ণ! নারায়ণ! তোমার দিব্য, কিছু বলে নি। মন্ত্রী বললে, 'ঠাকুর, যা বললুম তা ছাড়া একটি কথা বোলো না। দেখো, তোমাকে যেন একটুও সন্দেহ না করে।' আমি বললুম, 'হে রাম! সন্দেহ কেন করবে! তবে বলা যায় না। আমি তো সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দগ্ধ হবেন তিনি হবেন।' হরি হে, তুমিই সত্য।

জয়সেন ॥ পুজো-উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ তো সামান্য কথা—এতে সন্দেহ হবার কী কারণ থাকতে পারে?

ত্রিবেদী ॥ তোমরা বড়ো লোক, তোমাদের এইরকমই হয়। নইলে 'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি' বলবে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে 'আয় তো রে পাষণ্ড, তোর মুণ্ডুটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি'—অমনি তোমাদের উপলব্ধ হয় যে, আর যাই হোক, লোকটা প্রবঞ্চনা করছে না, মুণ্ডুটার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে। কিন্তু, যদি কেউ বলে 'এসো

তো বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই'— অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডুটা ধরে টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ! হে ভগবান! যদি রাজা স্পষ্ট করেই বলত 'একবার হাতের কাছে এস তো, তোমাদের এক-একটাকে ধরে রাজ্য থেকে নির্বাসন করে পাঠাই'— তা হলে এটা কখনও সন্দেহ করতে না যে, হয়তো বা রাজকন্যার সঙ্গে পরিণাম-বন্ধন করবার জন্যেই রাজা ডেকে থাকবেন। কিন্তু, রাজা বলছেন নাকি 'হে বন্ধুসকল, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব, অতএব তোমরা পুজো-উপলক্ষে এখানে এসে কিঞ্চিৎ ফলাহার করবে'— অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে সে ফলাহারটা কী রকমের না জানি! হে মধুসূদন! তা, এমনি হয় বটে। বড়ো লোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড়ো কথায় সন্দেহ হয়।

জয়সেন ॥ ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যেটুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙে গেছে।

ত্রিবেদী ॥ তা, ঠিক কথা বলেছ। আমি তোমাদের মতো বুদ্ধিমান নই, সকল কথা তলিয়ে বুঝতে পারি নে, কিন্তু, বাবা, সরল— পুরাণ-সংহিতায় যাকে বলে, অন্যে পরে কা কথা, অর্থাৎ অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকি নে।

জয়সেন ॥ আর কাকে কাকে তুমি নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছ?

ত্রিবেদী ॥ তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী স্বভাব যেমন তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ। তা, এ রাজ্যে তোমাদের গুষ্টির যেখানে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি! কেউ বাদ যাবে না।

জয়সেন ॥ যাও ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করো গে।

ত্রিবেদী ॥ যা হোক, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে, মন্ত্রী এ কথা শুনলে ভারি খুশি হবে। মুকুন্দ মুরহর মুরারে!

প্রস্থান

জয়সেন ॥ মিহিরগুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝলে তো? এখন গৌরসেন যুধাজিৎ উদয়ভাস্কর ওদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বলো, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহিরগুপ্ত ॥ যে আজ্ঞে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

বিক্রমদেব ও রানীর আত্মীয় সভাসদ

সভাসদ ॥ ধন্য মহারাজ!

বিক্রমদেব ॥ কেন এত ধন্যবাদ?

সভাসদ ॥ মহত্বের এই তো লক্ষণ— দৃষ্টি তার
সকলের 'পরে। ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্র জনে
পায় না দেখিতে। প্রবাসে পড়িয়া আছে
সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা। সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে।

বিক্রমদেব ॥ যাও যাও! তুচ্ছ কথা,
তার লাগি এত যশোগান! জানিও নে
আহূত হয়েছে কারা পূজার উৎসবে।

সভাসদ ॥ রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাই পরিশ্রম,
নাই তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি তার। জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনককিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।

বিক্রমদেব ॥ থামো থামো, যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদগণ
করে স্তুতিবৃষ্টি। বলা তো হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা? যাও এবে।

সভাসদের প্রস্থান

সুমিত্রার প্রবেশ

কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রানী।
রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন ব'লে। ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত, শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারানী, রাজরাজেশ্বরী।

সুমিত্রা। মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু।

বিক্রমদেব। অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি!
কর্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু, মহারানী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলি-মাঝে? নহে তাহা। জানি আমি
আপন ক্ষমতা। রয়েছে দুর্জয় শক্তি
এ হৃদয়-মাঝে, প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি

বিদ্যুতের মালা, পরায়েছি কণ্ঠে তব।

সুমিত্রা ॥ ঘৃণা করো মহারাজ, ঘৃণা করো মোরে
সেও ভালো— একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়— ক্ষুদ্র এ নারীর 'পরে
করিয়ো না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ।

বিক্রমদেব ॥ এত প্রেম, হায় তার এত অনাদর!
চাহ না এ প্রেম! না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া। উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ম বিদ্ধ করি। ধূলিতে দিতেছ ফেলি,
নির্মম, নিষ্ঠুর! পাষাণপ্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে
তত বাজে বুকে।

সুমিত্রা ॥ চরণে পতিত দাসী,
কী করিতে চাও করো। কেন তিরস্কার!
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন!
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে!

বিক্রমদেব ॥ প্রিয়তমে,
উঠ উঠ, এসো বুকে— স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্বাণ।
কত সুধা, কত ক্ষমা, ওই অশ্রুজলে,
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর!
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে

প্রেম-উৎস ছুটে— অর্জুনের শরাঘাতে
মর্মাহত ধরণীর ভোগবতী-সম।

নেপথ্যে ॥ মহারানী!

সুমিত্রা ॥ (অশ্রু মুছিয়া)
দেবদত্ত! আয়, কী সংবাদ?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ॥ রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা, বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা ॥ শুনিতেছ মহারাজ?

বিক্রমদেব ॥ দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।

দেবদত্ত ॥ মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে,
তাই সেথা নৃপতির পাই নে দর্শন।

সুমিত্রা ॥ স্পর্ধিত কুক্কুর যত বর্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে। রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে! একি অহংকার!
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়!
মন্ত্রণার কী আছে বিষয়! সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে।

বিক্রমদেব ॥ সেনাপতি শত্রুপক্ষ—

সুমিত্রা ॥ নিজে যাও তুমি।

বিক্রমদেব ॥ আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, কণ্ঠলগ্ন কাঁটা?

হেথা হতে এক পদ নড়িব না রানী,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব! ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্ত সর্প জাগাইয়া তুলি
একি খেলা! আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ!

সুমিত্রা ॥ ধিক এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক আমি, এ রাজ্যের রানী!

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ দেবদত্ত,
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার! বৃথা আশা!
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখে নি প্রণয়।
ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্বতের মতো
একা মহাশূন্য-মাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন নীরস মহিমা — ঝঞ্ঝাবায়ু
করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, সূর্য
রক্তনেত্রে চাহে, ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া। কিন্তু, ভালোবাসা কোথা!
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
কাঁদে। হায় বন্ধু, মানবজীবন লয়ে
রাজত্বের ভান করা শুধু বিড়ম্বনা।
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
ধরা-সাথে হোক সমতল, একবার

হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের।
বাল্যসখা, রাজা বলে ভুলে যাও মোরে,
একবার ভালো করে করো অনুভব
বান্ধবহৃদয়ব্যথা বান্ধবহৃদয়ে।

দেবদত্ত ॥ সখা, এ হৃদয় মোর জানিও তোমার।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি সব অকাতরে, রোষানল
লব বক্ষ পাতি— যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্রমদেব ॥ দেবদত্ত,
সুখনীড়-মাঝে কেন হানিছ বিরহ?
সুখস্বর্গ-মাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি?

দেবদত্ত ॥ সখা, আগুন লেগেছে ঘরে—
আমি শুধু এনেছি সংবাদ, সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙায়ে।

বিক্রমদেব ॥ এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভালো।

দেবদত্ত ॥ ধিক্ লজ্জা মহারাজ!
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বপ্নসুখ
বেশি হল!

বিক্রমদেব ॥ যোগাসনে লীন যোগীবর,
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়!
স্বপ্ন এ সংসার। অর্ধশতবর্ষ-পরে

আজিকার সুখদুঃখ কার মনে রবে ?—
যাও যাও দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব।
আপন সান্ত্বনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রানী।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

পুরুষবেশে রানী সুমিত্রা

বাহিরে অনুচর

সুমিত্রা ॥ জগৎ-জননী মাতা, দুর্বলহৃদয়
তনয়ারে করিয়ো মার্জনা। আজ সব
পূজা ব্যর্থ হল— শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুটি,
সেই শয্যা-'পরে একা সুপ্ত মহারাজ।
হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন!
দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী,
প্রতি পদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ-পানে!
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ। মা গো, সে দিনের কথা
দেখ্ মনে করে। জননী, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে, রমণীর
ভালোবাসা ছিন্নশতদলসম দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি— বল দাও জননী আমারে।
থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
'ফিরে এসো, ফিরে এসো রানী'— প্রেমপূর্ণ

পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়্গ নিয়ে
তুমি এসো, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বলো,—
'তুমি যাও, রাজধর্ম উঠুক জাগিয়া!
ধন্য হোক রাজা, প্রজা হোক সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক কল্যাণ, দূর হোক যত
অত্যাচার, ভূপতির যশোরশ্মি হতে
ঘুচে যাক কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও— একাকিনী
বসে বসে নিজ দুঃখে মরো বুক ফেটে।'
পিতৃসত্যপালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে, পতিসত্যপালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী-কাছে, কভু তাহা
সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।

বাহিরে একজন পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ

অনুচর ॥ কে তোরা? দাঁড়া এইখানে।

পুরুষ ॥ কেন বাবা? এখানেও কি স্থান নেই?

স্ত্রী ॥ মা গো! এখানেও সেই সিপাই!

সুমিত্রার বাহিরে আগমন

সুমিত্রা ॥ তোমরা কে গো?

পুরুষ ॥ মিহিরগুপ্ত আমাদের ছেলেটিকে ধরে রেখে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাটুকু নেই— তাই আমরা মন্দিরে এসেছি। মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব— দেখি, তিনি

আমাদের কী গতি করেন।

স্ত্রী ॥ তা, হাঁ গা, এখেনেও তোমরা সিপাই রেখেছ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার মায়ের দরজাও আগলে দাঁড়িয়েছ?

সুমিত্রা ॥ না বাছা, এসো তোমরা। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। কে তোমাদের উপর দৌরাত্ম্য করেছে?

পুরুষ ॥ এই জয়সেন। আমরা রাজার কাছে দুঃখু জানাতে গিয়েছিলেম —রাজদর্শন পেলেম না। ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘর-দোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমাদের ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

সুমিত্রা ॥ (স্ত্রীলোকের প্রতি) হাঁ গা, তা তুমি রানীকে গিয়ে জানালে না কেন?

স্ত্রী ॥ ওগো, রানীই তো রাজাকে জাদু করে রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো, রাজার দোষ নেই, ঐ বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে — সে আপন কুটুম্বদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে গো।

পুরুষ ॥ চুপ কর্, মাগি। তুই রানীর কী জানিস্। যে কথা জানিস্ নে তা মুখে আনিস্ নে।

স্ত্রী ॥ জানি গো জানি। ঐ রানীই তো বসে বসে রাজার কাছে আমাদের নামে যত কথা লাগায়।

সুমিত্রা ॥ ঠিক বলেছ বাছা। ঐ রানী সর্বনাশীই তো সত নষ্টের মূল! তা, সে আর বেশি দিন থাকবে না, তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এই নাও, আমার সাধ্যমতো কিছু দিলাম— সব দুঃখ দূর করতে পারি নে।

পুরুষ ॥ আহা, তুমি কোনো রাজার ছেলে হবে, তোমার জয় হোক।

সুমিত্রা ॥ আর বিলম্ব নয়, এখনি যাব।

প্রস্থান

ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী ॥ হে হরি, কী দেখলুম! পুরুষমূর্তি ধরে রানী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপুজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড়ো খুশি! মধুসূদন! ভাবলে, 'ব্রাহ্মণ বড়ো সরলহৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নেই। একে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক। এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক।' বাবা, তোমরা বেঁচে থাকো। যখনি তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো ত্রিবেদীকে ডেকো, আর দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়! তা, বলব। খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বলব। আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে। কমললোচন! রাজা কী খুশিই হবে! কথাগুলো যত বড়ো বড়ো করে বলব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড়ো কথাগুলো শোনায় ভালো। লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়। বলে, ব্রাহ্মণ বড়ো সরল। পতিতপাবন! এবারে কতটা আমোদ হবে বলতে পারি নে। কিন্তু, শব্দশাস্ত্র একেবারে উলট-পালট করে দেব। আঃ, কী দুর্যোগ! আজ সমস্ত দিন দেবপুজো হয় নি, এইবার একটু পুজো-অর্চনায় মন দেওয়া যাক। দীনবন্ধু! ভক্তবৎসল!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

বিক্রমদেব, মন্ত্রী ও দেবদত্ত

বিক্রমদেব ॥ পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন। এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়। এই রাজ্য!
এই কি মহিমা তার! বৃহৎ প্রতাপ
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো, ক্ষুদ্র পাখি
উড়ে চলে যায়।

মন্ত্রী ॥ হায় হায়, মহারাজ,
লোকনিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত-সম,
ছুটে চারি দিক হতে!

বিক্রমদেব ॥ চুপ করো মন্ত্রী।
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক অলস লোকের।
দিবা যদি গেল, উঠুক-না চুপিচুপি
ক্ষুদ্র পঙ্ককুণ্ড হতে দুষ্ট বাষ্পরাশি—
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোকনিন্দা!

দেবদত্ত ॥ মন্ত্রী, পরিপূর্ণ সূর্য-পানে

কে পারে তাকাতে ? তাই, গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্তলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দিনের দিনপতি-পানে,
আপনার কালীমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো।— মহারানী,
মা জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার!
তব নাম ধুলায় লুটায়! তব নাম
ফিরে মুখে মুখে! একি এ দুর্দিন আজি!
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী, এরা সব
পথের কাঙাল।

বিক্রমদেব ॥ ত্রিবেদী কোথায় গেল ?
মন্ত্রী, ডেকে আনো তারে। শোনা হয় নাই
তার সব কথা, ছিনু অন্যমনে।

মন্ত্রী ॥ যাই
ডেকে আনি তারে।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ এখনো সময় আছে,
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান।
আবার সন্ধান! এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন! সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে! প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজধর্ম ফেলে, শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব!
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত

করো পলায়ন— গৃহহীন প্রেমহীন
বিশ্রামবিহীন অনাবৃত পৃথ্বী-মাঝে
কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া।

ত্রিবেদীর প্রবেশ

চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে।
বার বার তার কথা কে চাহে শুনিতে—
প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ!

ত্রিবেদী ॥ হে মধুসূদন!

প্রস্থানোদ্যম

বিক্রমদেব ॥ শোনো, শোনো, দুটো কথা শুধাবার আছে।
চোখে অশ্রু ছিল?

ত্রিবেদী ॥ চিন্তা নেই বাপু। অশ্রু
দেখি নাই।

বিক্রমদেব ॥ মিথ্যা করে বলো। অতি ক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যা কথা! হে ব্রাহ্মণ,
বৃদ্ধ তুমি, ক্ষীণদৃষ্টি, কী করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কিনা! বেশি নয়,
একবিন্দু জল! নহে তো নয়নপ্রান্তে
ছলছল-ভাব, কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী? তাও নয়? সত্য বলো।
মিথ্যা বলো। বোলো না, বোলো না— চলে যাও।

ত্রিবেদী ॥ হরি হে, তুমিই সত্য।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালোবাসা। পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়— অবশেষে সেও চলে গেল।
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর ;
রাজধর্ম ফিরে দাও ; পুরুষহৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ-মাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র ? কোথা জনস্রোত ? কোথা
জীবনমরণ ? কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখদুঃখ- বিপদসম্পদ-
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস ?

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী ॥ মহারাজ, অশ্বারোহী
পাঠায়েছি চারি দিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে।

বিক্রমদেব ॥ ফিরাও ফিরাও মন্ত্রী। স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া ?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ।

মন্ত্রী ॥ যে আদেশ মহারাজ।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ দেবদত্ত, কেন নত মুখ, ম্লান দৃষ্টি ?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলো না ব্রাহ্মণ।
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর—

আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে। আজি সখা,
আনন্দের দিন। এসো আলিঙ্গনপাশে।

আলিঙ্গন করিয়া

বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান।
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে, বিঁধিছে
মর্মে। এসো এসো, একবার অশ্রুজল
ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে। মেঘ যাক কেটে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর। প্রাসাদসম্মুখে রাজপথ

দ্বারে শংকর

শংকর ॥ এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে সংকলদাদা বলত। এখন বড়ো হয়ে উঠেছে, এখন সংকলদাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের দুটি ভাইবোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটি তো দুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম, কুমারসেনকে আমার কোল থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব। কিন্তু, খুড়ো-মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজ কাল ক'রে আর সময় হল না। কত ওজর, কত আপত্তি! আরে ভাই, সংকলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বুড়ো হয়ে গেলুম, তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব!

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক ॥ আমাদের যুবরাজ কবে রাজা হবে রে ভাই? সেদিন আমি তোদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব।

দ্বিতীয় সৈনিক ॥ আরে, তুই তো মহুয়া খাওয়াবি— আমি জান দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুঠ করে আনব। আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙে দেব। বলিস তো, আমি খুশি হয়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমনি মরে পড়ে যাব।

প্রথম সৈনিক ॥ তা কি আমি পারি নে? মরবার কথা কী বলিস?] আমার যদি সওয়া-শ বরষ পরমায়ু থাকে আমি যুবরাজের জন্যে রোজ নিয়মিত দু সন্ধে দুবার করে মরতে পারি— তা ছাড়া উপরি আছে।

দ্বিতীয় সৈনিক ॥ ওরে, যুবরাজ তো আমাদেরই। স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে রাজা করে দেব। তা, কাউকে ভয় করব না—

প্রথম সৈনিক ॥ খুড়ো-মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এসো, আমরা রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ করতে চাই।

দ্বিতীয় সৈনিক ॥ শুনেছিস? পূর্ণিমাতিথিতে যুবরাজের বিয়ে।

প্রথম সৈনিক। সে তো পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি।

দ্বিতীয় সৈনিক ॥ এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিচুড়ের রাজবংশে নিয়ম চলে আসছে যে, পাঁচ বৎসর রাজকন্যার অধীন হয়ে থাকতে হবে। তার পর তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

প্রথম সৈনিক। বাবা, এ আবার কী নিয়ম! আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে আসছে, শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি— ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। তার পরে আবার দশটা বিয়ে করবার ফুরসৎ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সৈনিক ॥ যোধমল, সেদিন কী করবি বল্ দেখি।

প্রথম সৈনিক। সেদিন আমিও আর-একটা বিয়ে করে ফেলব।

দ্বিতীয় সৈনিক। শাবাশ বলেছিস রে ভাই!

প্রথম সৈনিক। মতিচাঁদের মেয়ে। খাসা দেখতে ভাই! কী চোখ রে! সেদিন বিতস্তায় জল আনতে যাচ্ছিল, দুটো কথা বলতে গেলুম, কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখলুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট সরে পড়তে হল।

গান

ঐ আঁখি রে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়ো না, ফিরে যাও—
কী আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ—
কী সুখে পরান আর রাখি রে!

দ্বিতীয় সৈনিক॥ শাবাশ ভাই।

প্রথম সৈনিক॥ ঐ দেখ্, শংকরদাদা। যুবরাজ এখানে নেই, তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট-পালট হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

দ্বিতীয় সৈনিক॥ আয় ভাই, ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক।

প্রথম সৈনিক॥ জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতোজোড়াটার মতো পড়ে আছে, মুখে কথাটি নেই।

দ্বিতীয় সৈনিক॥ (শংকরের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলো-না দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে?

শংকর॥ তোদের সে খবরে কাজ কী।

প্রথম সৈনিক॥ না না, বলছি, আমাদের যুবরাজের বয়স হয়েছে, এখনও খুড়োরাজা নাবছে না কেন?

শংকর॥ তাতে দোষ হয়েছে কী? হাজার হোক, খুড়ো তো বটে।

দ্বিতীয় সৈনিক॥ তা তো বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম— আমাদের নিয়ম আছে যে—

শংকর ॥ নিয়ম তোরা মানবি, আমরা মানব, বড়োলোকের আবার নিয়ম কী! সবাই যদি নিয়ম মানবে তবে নিয়ম গড়বে কে?

প্রথম সৈনিক ॥ আচ্ছা দাদা, তা যেন হল, কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা— এ কেমন নিয়ম দাদা? আমি তো বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মতো— চট করে লাগল তীর, তার পরে ইহজন্মের মতো বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না। কিন্তু দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কিরকম কারখানা!

শংকর ॥ তোদের আশ্চর্য ঠেকবে বলে কি যে দেশের যা নিয়ম তা উল্টে যাবে? নিয়ম তো কারো ছাড়বার জো নেই। এ সংসার নিয়মেই চলছে। যা যা, আর বকিস নে, যা। এ-সকল কথা তোদের মুখে ভালো শোনায় না।

প্রথম সৈনিক ॥ তা, চললুম। আজকাল আমাদের দাদার মেজাজ ভালো নেই। একেবারে শুকিয়ে যেন খড়্‌খড়্‌ করছে।

সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। তুমি কি শংকরদাদা?

শংকর। কে তুমি ডাকিলে

পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা স্বরে।

কে তুমি পথিক?

সুমিত্রা। এসেছি বিদেশ হতে।

শংকর। একি স্বপ্ন দেখি আমি! কী মন্ত্রকুহকে

কুমার আবার এল বালক হইয়া

শংকরের কাছে। যেন সেই সন্ধ্যাবেলা,

খেলাশ্রান্ত সুকুমার বাল্যতনুখানি,
চরণকমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল,
ক্লান্ত শিশুহিয়া— বৃদ্ধ শংকরের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।

সুমিত্রা ॥ জালন্ধর হতে আমি
এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শংকর ॥ কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে। শৈশবের খেলাধুলা
মনে করে দিতে, ছোটো বোন পাঠায়েছে
তারে। দূত, তুমি এ মূর্তি কোথায় পেলে ?—
মিছে বকিতেছি কত! ক্ষমা করো মোরে।
বলো বলো কী সংবাদ। রানীদিদি মোর
ভালো আছে, সুখে আছে পতির সোহাগে—
মহিষীগৌরবে ? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্বাদ ? রাজলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ ?—
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চলো
গৃহে চলো। বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চলো।

সুমিত্রা ॥ শংকর, মনে কি আছে এখনো রানীরে ?

শংকর ॥ সেই কণ্ঠস্বর! সেই গভীর গম্ভীর
দৃষ্টি স্নেহভারনত। একি মরীচিকা!
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়াখানি! মনে নাই তারে! তুমি বুঝি

তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে!
বার্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা করো যুবা।
বহুদিন মৌন ছিনু— আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল। নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে তোমা-'পরে!
যেন তুমি চিরপরিচিত। যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়। ক্রীড়াকানন

কুমারসেন, ইলা ও সখীগণ

ইলা ॥ যেতে হবে? কেন যেতে হবে যুবরাজ?
ইলারে লাগে না ভালো দু দণ্ডের বেশি?
ছি ছি চঞ্চলহৃদয়!

কুমারসেন ॥ প্রজাগণ সবে—

ইলা ॥ তারা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে? রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই। যত ক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর তত ক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি। রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্যভার,
কত রাজ-আড়ম্বর— আর সব আছে—
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই।

কুমারসেন ॥ সব আছে,
তবু কিছু নাই— তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে।

ইলা ॥ মিছে কথা বোলো না কুমার।—
তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে
আমি রানী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে?

যেতে আমি দিব না তোমারে। সখী, তোরা
আয়। এরে বাঁধ্ ফুলপাশে, কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলি রাজ্যের ভাবনা।

সখীদের গান

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই'।
ধরে রাখো, ধরে রাখো,
সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে 'মিশে যাই'।
জেগে থাকো, জেগে থাকো,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়।

কুমারসেন॥ আমারে কী করেছিস, অয়ি কুহকিনী!
নির্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন মন
নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে। যেন আমি
আমারে ভাঙিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে। যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়নপল্লবে,
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে, বাহু দুটি
ললিত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া,

মিলনসুখের মতো কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে।

ইলা ॥ তার পরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে। গীতহীনা বীণা-সম
আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুন্ গুন্ গাহি অন্যমনে। না না সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলনপাশ
কখন্ বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্মে মর্মে, জীবনে জীবনে ?

কুমারসেন ॥ সে তো আর দেরি নাই— আজি সপ্তমীর
অর্ধচাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণশশী হয়ে
দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন।
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ,
আজি তার শেষ। দূরে থেকে কাছাকাছি,
কাছে থেকে তবু দূর, আজি তার শেষ।
সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময়রাশি,
সহসা মিলন, সহসা বিরহব্যথা,
বনপথ দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
শূন্য গৃহ-পানে সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
প্রতি কথা প্রতি হাসিটুকু শতবার
উলটি-পালটি মনে— আজি তার শেষ।
মৌন লজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,

অশ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা—
আজি তার শেষ।

ইলা ॥ আহা, তাই যেন হয়।
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভালো, দুঃখ
সেও ভালো। তৃষ্ণা ভালো মরীচিকা চেয়ে
কখন তোমারে পাব, কখন পাব না,
তাই সদা মনে হয়— কখন হারাব।
একা বসে বসে ভাবি, কোথা আছ তুমি,
কী করিছ! কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানি নে আর, পাই নে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্বদা—
কিছুই রবে না আর অচেনা অজানা,
অন্ধকার। ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমারসেন ॥ ধরা তো দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বলো দেখি,
কী তুমি পাও নি, কোথা রয়েছে অভাব।

ইলা ॥ যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে।
মনে হয়, সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন-কাছে। কভু মনে হয়,
যদি সে ফিরিয়া আসে, বাল্যসহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখশৈশবের

খেলাঘরে— সেথা তারি তুমি। সেথা মোর
নাই অধিকার। মাঝে মাঝে সাধ যায়,
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার।

কুমারসেন ॥ সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত।
উৎসবের আনন্দকিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলংকারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন। আর কি সে মনে করে
আমাদের! পরগৃহে পর হয়ে আছে।

ইলার গান

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর—
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখে দুখে,
ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চির জীবননির্ভর॥

কুমারসেন ॥ কেন এ করুণ স্বর! কেন দুঃখগান!
বিষণ্ণ নয়ন কেন!

ইলা ॥ একি দুঃখগান!
শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন
উদার উদাস! সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্মবিসর্জন করি রমণীর সুখ।

কুমারসেন ॥ পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।

আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্ব-মাঝে। শ্রান্তিহীন কর্মসুখতরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্তি করিয়া অর্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
বিরলে বিলাসে বসে এ অগাধ প্রেম
পারি নে করিতে ভোগ অলসের মতো।

ইলা॥ ওই দেখো রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্বতশৃঙ্গ,
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমারসেন॥ দক্ষিণে চাহিয়া দেখো— অস্তরবিকরে
সুবর্ণসমুদ্রসম সমতলভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্ব-পানে!
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি— যেন স্বর্ণচিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণসমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটে নি। যেন আকাঙ্ক্ষা আমারি
শৈল-অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হয়ে হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি।
আহা, হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্তি, কত নব রঙ্গভূমি!

ইলা॥ অনন্তের মূর্তি ধরে ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস। নাথ, কাছে এসো।
আহা, যদি চিরকাল এই মেঘ-মাঝে

লুপ্ত বিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে—
দুটি পাখি একমাত্র মহামেঘনীড়ে !
পারিতে থাকিতে তুমি ? মেঘ-আবরণ
ভেদ করে কোথা হতে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান ; তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা ॥ কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে।

কুমারসেন ॥ তবে যাই প্রিয়ে।
আবার আসিব ফিরে পূর্ণিমার রাতে,
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে।

প্রস্থান

ইলা ॥ যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে ! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি ! কী বৃহৎ এ সংসার !
কী উদ্দাম তোমার হৃদয় ! কে জানিবে
আমার বিরহ ! কে গনিবে অশ্রু মোর !
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্মকাতরতা !

তৃতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর। যুবরাজের প্রাসাদ

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা

কুমারসেন ॥ কত যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী? আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল— যেতে চাই আমি
এখনি লইয়া সৈন্য, দুর্বিনীত সেই
দস্যুদের করিতে দমন, কাশ্মীরের
কলঙ্ক করিতে দূর। কিন্তু, পিতৃব্যের
পাই নে আদেশ। ছদ্মবেশ দূর করো
বোন। চলো মোরা যাই দোঁহে, পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে।

সুমিত্রা ॥ সে কী কথা ভাই? আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগিনীর মনোব্যথা। আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিনী রানী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?
ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয়। আপনার
পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন! কতবার
বৃদ্ধ শংকরের কাছে কণ্ঠ রুদ্ধ হল
অশ্রুভরে; কতবার মনে করেছিনু

কাঁদিয়া তাহারে বলি, 'শংকর, শংকর,
তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের।' হায় বৃদ্ধ, কত অশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে!
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের,
আজ আমি জালন্ধর-রানী।

কুমারসেন ॥ বুঝিয়াছি
বোন। যাই দেখি, অন্য কী উপায় আছে।

চতুর্থ দৃশ্য

কাশ্মীরপ্রাসাদ। অন্তঃপুর

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী ॥ যেতে দাও মহারাজ। কী ভাবিছ বসি?
ভাবিছ কী লাগি? যাক যুদ্ধে— তার পরে
দেবতাকৃপায়, আর যেন নাহি আসে
ফিরে।

চন্দ্রসেন ॥ ধীরে রানী, ধীরে।

রেবতী ॥ ক্ষুধিত মার্জার
বসে ছিলে এতদিন সময় চাহিয়া,
আজ তো সময় এল— তবু আজো কেন
সেই বসে আছ!

চন্দ্রসেন ॥ কে বসিয়া ছিল রানী,
কিসের লাগিয়া?

রেবতী ॥ ছি ছি, আবার ছলনা!
লুকাবে আমার কাছে? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাও নি বিবাহ?
কেন বা সম্মতি দিলে ত্রিচূড়রাজ্যের
এই অনার্য প্রথায়— পঞ্চবর্ষ ধ'রে
কন্যার সাধনা?

চন্দ্রসেন ॥ ধিক্! চুপ করো রানী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায়!

রেবতী ॥ তবে, বুঝে

দেখো ভালো করে। যে কাজ করিতে চাও

জেনে শুনে করো। আপনার কাছ হতে

রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন।

দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে

করিবে না তব লক্ষ্যভেদ। নিজ হাতে

উপায় রচনা করো অবসর বুঝে।

বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়,

তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ!

কুমারে পাঠাও যুদ্ধে।

চন্দ্রসেন ॥ বাহিরে রয়েছে

কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে

আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয়।

ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার?

রেবতী ॥ অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।

আপাতত পাঠাও কুমারে। প্রজাগণ

ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক-তরে,

তাদের থামাও কিছুদিন। ইতিমধ্যে

কত-কী ঘটিতে পারে। পরে ভেবে দেখো।

কুমারের প্রবেশ

রেবতী ॥ (কুমারের প্রতি)

যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ—

বিলম্ব কোরো না আর, বিবাহ-উৎসব

পরে হবে। (দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিয়ো না গৃহে বসে আলস্য-উৎসবে।)

কুমারসেন ॥ জয় হোক, জয় হোক জননী, তোমার।
এ কী আনন্দসংবাদ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ।

চন্দ্রসেন ॥ যাও তবে। দেখো বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন-'পরে।

কুমারসেন ॥ মাগি জননীর
আশীর্বাদ।

রেবতী ॥ কী হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে!
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু।

পঞ্চম দৃশ্য

ত্রিচূড়। ক্রীড়াকানন

ইলার সখীগণ

প্রথম সখী ॥ আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই ?

দ্বিতীয় সখী ॥ আলোর জন্যে ভাবি নে। আলো তো কেবল এক রাত্রি জ্বলবে। কিন্তু, বাঁশি এখনো এল না কেন ? বাঁশি না বাজলে আমোদ নেই ভাই।

তৃতীয় সখী ॥ বাঁশি কাশ্মীর থেকে আনতে গেছে, এতক্ষণে এল বোধ হয়। কখন বাজবে ভাই ?

প্রথম সখী ॥ বাজবে লো বাজবে। তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজবে।

তৃতীয় সখী ॥ পোড়াকপাল আর কি! আমি সেই জন্যেই ভেবে মরছি।

প্রথম সখীর গান

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে—
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি—
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল—
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে।

দ্বিতীয় সখী ॥ তোর গান রেখে দে। এক-একবার মন কেমন হয়

করে উঠছে। মনে পড়ছে, কেবল একটি রাত আলো হাসি বাঁশি আর গান। তার পরদিন সমস্ত অন্ধকার।

প্রথম সখী॥ কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন। এই দুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে নে। ফুল যদি না শুকোত তা হলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথতে বসতুম।

দ্বিতীয় সখী॥ আমি বাসরঘর সাজাব।

প্রথম সখী॥ আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

তৃতীয় সখী॥ আর, আমি কী করব?

প্রথম সখী॥ ওলো, তুই আপনি সাজিস। দেখিস, যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস।

তৃতীয় সখী॥ তুই তো ভাই, চেষ্টা করতে ছাড়িস নি। তা, তুই যখন পারলি নে তখন কি আর আমি পারব? ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে তার মন কি আর অমনি পথে ঘাটে চুরি যায়? ঐ বাঁশি এসেছে। ঐ শোন্ বেজে উঠেছে।

প্রথম সখীর গান

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে—
বনমাঝে কি মনমাঝে!
বসন্তবায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল!
বলো গো সজনী, এ সুখরজনী কোন্‌খানে উদিয়াছে—
বনমাঝে কি মনমাঝে।
যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনমাঝে!

দ্বিতীয় সখী ॥ ওলো থাম্— ঐ দেখ্ যুবরাজ কুমারসেন এসেছেন!

তৃতীয় সখী ॥ চল্ চল্ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই গে। তোরা পারিস, কিন্তু কে জানে ভাই, যুবরাজের সামনে যেতে আমার কেমন করে।

দ্বিতীয় সখী ॥ কিন্তু, কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন!

প্রথম সখী ॥ ওলো, এর কি আর সময়-অসময় আছে! রাজার ছেলে বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয়! থাকতে পারবে কেন!

তৃতীয় সখী ॥ চল্ ভাই, আড়ালে চল্।

অন্তরালে গমন

কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ

ইলা ॥ থাক্ নাথ, আর বেশি বোলো না আমারে।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত রবে কিছু কাল — এর
বেশি কী আর শুনিব!

কুমারসেন ॥
এমনি বিশ্বাস
মোর 'পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে
মন বোঝা যায়; গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে।
প্রবাসীরে মনে কোরো এই উপবনে,
এই নির্ঝরিণীতীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিমগগনপ্রান্তে
ওই সন্ধ্যাতারা-পানে চেয়ে। মনে কোরো,
আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তরুর তলে

একেলা বসিয়া, ওই তারকার 'পরে
তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে।
মনে কোরো, মিশিতেছে এই নীলাকাশে
পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার
প্রেম. এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহরজনী-'পরে।

ইলা ॥ জানি, জানি নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়।

কুমারসেন ॥ যাই তবে
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
সর্বস্বরূপিণী, অয়ি সবার অধিক!

প্রস্থান

সখীগণের প্রবেশ

দ্বিতীয় সখী ॥ হায়, এ কী শুনি!

তৃতীয় সখী ॥ সখী, কেন যেতে দিলে!

প্রথম সখী ॥ ভালোই করেছ। স্বেচ্ছায় না দিলে ছাড়ি
বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন-তরে।
হায় সখী, হায়, শেষে নিবাতে হল কি
উৎসবের দীপ!

ইলা ॥ সখী, তোরা চুপ কর্,
টুটিছে হৃদয়। ভেঙে দে, ভেঙে দে এই
দীপমালা। বল্ সখী, কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো! কেন আজ

মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে!
অমনি ইলারে কেন অস্তপথ-পানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর। রণক্ষেত্র-শিবির

বিক্রমদেব ও সেনাপতি

সেনাপতি॥ বন্দীকৃত শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর,
শুধু যুধাজিৎ পলাতক— সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল।

বিক্রমদেব॥ চলো তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে ; উঠাও শিবির তবে।
ভালোবাসি আমি এই ব্যগ্র উর্ধ্বশ্বাস
মানবমৃগয়া ; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদীতীরে দিবারাত্রি এই
কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকি আছে আর
কেবা বিদ্রোহী দলের ?

সেনাপতি॥ শুধু জয়সেন।
কর্তা সেই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার
সব চেয়ে বেশি।

বিক্রমদেব॥ চলো তবে সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম
বুকে বুকে, বাহুতে বাহুতে— অতি তীব্র

প্রেম-আলিঙ্গনসম। ভালো নাহি লাগে
অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্‌ঝনি— ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয়লাভ।

সেনাপতি ॥ কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা, করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ; বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব-তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রমদেব ॥ ধিক্‌ ভীরু, কাপুরুষ!
সন্ধি নহে— যুদ্ধ চাই আমি। রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত— অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের
ধ্বনি। চলো সেনাপতি।

সেনাপতি ॥ যে আদেশ প্রভু।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ এ কী মুক্তি! এ কী পরিত্রাণ! কী আনন্দ
হৃদয়-মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর-মাঝে! উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল-পানে।
মুক্তি! মুক্তি আজি! শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন
এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্তি, কত রঙ্গ, কত কী চলিতেছিল

কর্মের প্রবাহ— আমি ছিনু অন্তঃপুরে
প'ড়ে, রুদ্ধদল চম্পককোরক-মাঝে
সুপ্ত কীটসম। কোথা ছিল লোকলাজ!
কোথা ছিল বীরপরাক্রম! কোথা ছিল
এ বিপুল বিশ্বতটভূমি! কোথা ছিল
হৃদয়ের তরঙ্গ-তর্জন! কে বলিবে
আজি মোরে দীন কাপুরুষ! কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী! মৃদু গন্ধবহ আজি
জাগিয়া উঠেছে বেগে ঝঞ্ঝাবায়ুরূপে।
এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে—
প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ।
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির
সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য।

বিক্রমদেব। চলো তবে চলো।

চরের প্রবেশ

চর। রাজন্, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোনো
যুদ্ধ-আস্ফালন ; মার্জনা-প্রার্থনা-তরে
আসিতেছে যেন।

বিক্রমদেব। থাক্, চাহি না শুনিতে
মার্জনার কথা। আগে আমি আপনারে

করিব মার্জনা ; অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চলো সেনাপতি।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

দ্বিতীয় চর ॥ বিপক্ষশিবির হতে আসিছে শিবিকা
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।

সেনাপতি ॥ মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা করো— আগে শোনা যাক
কী বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রমদেব ॥ যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক ॥ মহারানী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

বিক্রমদেব ॥ কে এসেছে!

সৈনিক ॥ মহারানী।

বিক্রমদেব ॥ মহারানী! কোন্ মহারানী?

সৈনিক ॥ আমাদের মহারানী।

বিক্রমদেব ॥ বাতুল! উন্মাদ!
যাও সেনাপতি। দেখে এসো কে এসেছে।

সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান

মহারানী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ-জয়সেনে! একি স্বপ্ন নাকি!
একি রণক্ষেত্র নয়! একি অন্তঃপুর!
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে

মগ্ন! সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে!
বন্দী? কারে বন্দী? কী শুনিতে কী শুনেছি?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী? দূত!
সেনাপতি! কে এসেছে? কারে বন্দী লয়ে?

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি॥ মহারানী এসেছেন লয়ে কাশ্মীরের
সৈন্যদল— সোদর কুমারসেন সাথে।
এসেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবিরদ্বারে সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রমদেব॥ সেনাপতি, পালাও, পালাও।
চলো, চলো, সৈন্য লয়ে— আর কি কোথাও
নাই শত্রু? আর কেহ নাহি কি বিদ্রোহী?
সাক্ষাৎ! কাহার সাথে! রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়।

সেনাপতি॥ মহারাজ—

বিক্রমদেব॥ চুপ করো সেনাপতি, শোনো যাহা বলি।
রুদ্ধ করো দ্বার— এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ-নিষেধ।

সেনাপতি॥ যে আদেশ মহারাজ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবদত্তের কুটির

দেবদত্ত ও নারায়ণী

দেবদত্ত ॥ প্রিয়ে, তবে অনুমতি করো— দাস বিদায় হয়।

নারায়ণী ॥ তা, যাও-না, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি নাকি?

দেবদত্ত ॥ ঐ তো, ঐ জন্যেই তো কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না— বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা বলি তা করো। ঐখানটায় আছাড় খেয়ে পড়ো। বলো, হা হতোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে! হা ভগবন্ মকরকেতন!

নারায়ণী ॥ মিছে বোকো না! মাথা খাও, সত্যি করে বলো কোথায় যাবে।

দেবদত্ত ॥ রাজার কাছে।

নারায়ণী ॥ রাজা তো যুদ্ধ করতে গেছে। তুমি যুদ্ধ করবে নাকি? দ্রোণাচার্য হয়ে উঠেছ?

দেবদত্ত ॥ তুমি থাকতে আমি যুদ্ধ করব?— যা হোক, এবার যাওয়া যাক।

নারায়ণী ॥ সেই অবধি তো ঐ এক কথাই বলছ। তা, যাও-না। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে!

দেবদত্ত ॥ হায় মকরকেতন, এখানে তোমার পুষ্পশরের কর্ম নয়— একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্মে গিয়ে পৌঁছয় না। বলি, শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জলটল কিছু বেরোবে কি? সেগুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো— আমি উঠি।

নারায়ণী ॥ পোড়া কপাল! চোখের জল ফেলব কী দুঃখে! হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধ চলবে না? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ?

দেবদত্ত ॥ আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থামবে না। মন্ত্রী বার বার লিখে পাঠাচ্ছে, রাজ্য ছারখারে যায়, কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এ দিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারায়ণী ॥ বিদ্রোহই যদি থেমে গেল তো মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন?

দেবদত্ত ॥ মহারানীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারায়ণী ॥ হাঁ গা, সে কী কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ! বোধ করি রাজায় রাজায় এইরকম করেই ঠাট্টা চলে? আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কী বল?

দেবদত্ত ॥ বড়ো ঠাট্টা নয়। মহারানী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ করতে দেন নি।

নারায়ণী ॥ হাঁ গা, বল কী! তা, তুমি এতদিন যাও নি কেন? এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও যাও, এখনি যাও। আমাদের রানীর মতো অমন সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে! রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে।

দেবদত্ত ॥ বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেছে, 'মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা, অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে, এতে তোমাকেই অপমান করা হল; যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল! এর চেয়ে

উপহাস আর কী হতে পারে!' এই শুনে মহারাজ আগুন হয়ে কুমার-সেনকে পাঁচটা ভৎ র্সনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবাপুরুষ, সহ্য করতে পারবে কেন! বোধ করি সেও দূতকে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে থাকবে।

নারায়ণী ॥ তা, বেশ তো, কুমারসেন তো রাজার পর নয়, আপনার লোক— তা, কথা চলছিল, বেশ, তাই চলুক। তুমি কাছে না থাকলে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও জোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কী বাপু! ওই ওতেই তো হার হল।

দেবদত্ত ॥ আসল কথা, একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন না। নানা ছল অন্বেষণ করছেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভালো কথা বলে, এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পারছি নে— আমি চললুম।

নারায়ণী ॥ যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না। তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল, তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগি হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত ॥ রোসো— আগে আমি ফিরে আসি, তার পর যেয়ো। বল তো আমি থেকে যাই।

নারায়ণী। না না, তুমি যাও। আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাকতে বলছি? ওগো, তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরব না, সে জন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেবদত্ত ॥ তা কি আর আমি জানি নে! মলয়সমীরণ তোমার কিছু করতে পারবে না। বিরহ তো সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না।

প্রস্থানোন্মুখ

নারায়ণী ॥ হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর। শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আনো।

দেবদত্ত ॥ এ ঘর ছেড়ে কখনো কোথাও যাই নি। হে ভগবান, এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জালন্ধর। কুমারসেনের শিবির

কুমারসেন ও সুমিত্রা

সুমিত্রা॥ ভাই, রাজারে মার্জনা করো ; করো রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে বীর নাম করিতে উদ্ধার।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি। জানি না কি অসম্মানশেল
চিরজীবী মৃত্যুসম মানীর হৃদয়ে ?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমানশর,
যেন আপনারি হস্তে! মৃত্যু ভালো ছিল—
ভাই, মৃত্যু ভালো ছিল।

কুমারসেন॥ জানিস তো বোন ?—
যুদ্ধ বীরধর্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?

সুমিত্রা॥ ধন্য ভাই,
ধন্য তুমি। সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ!
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ-মাঝে—

কুমারসেন। আমি ভাই তোর।

চল্ বোন, আমাদের সেই শৈলগৃহে
তুষারশিখর-ঘেরা শুভ্র সুশীতল
আনন্দকাননে। দুটি নির্ঝরের মতো
একত্রে করেছি খেলা দুই ভাইবোনে—
এখন, আর কি ফিরে যেতে পারিবি নে
সেই উচ্চ সেই শুভ্র শৈশবশিখরে?

সুমিত্রা। চলো ভাই, চলো। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে; সন্ধ্যাবেলা বসে তারে
তোমার মনের মতো সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালোবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান, কোন্ কাব্যরস।
শুনাব বাল্যের কথা; শৈশবমহত্ত্ব
তব শিশুহৃদয়ের।

কুমারসেন। মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা। আমি দৈর্ঘহীন
যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধ্যাবেলা
বাজাতিস, গম্ভীর আনন্দমুখখানি।
সংগীতেরে করে তুলেছিলি তোর সেই
ছোটো ছোটো অঙ্গুলির বশ।

সুমিত্রা। মনে আছে?
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে

অদ্ভুত কল্পনাকথা— কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণস্বর্গপুর,
অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
অমৃতমধুর ফল। ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম; স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নরকানন।

কুমারসেন ॥ বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হত একাকার, মেঘ আর
গিরির মতন; দেখিতে পেতেম যেন
দূর শৈলপরপারে রহস্যনগরী।—
শংকর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক
কী সংবাদ।

শংকরের প্রবেশ

শংকর ॥ প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা করো বৃদ্ধ এ শংকরে। ক্ষমা করো,
রানীদিদি মোর। মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে রাজার শিবিরে? আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচনবিন্যাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান?
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস, সভ্রূভঙ্গে

কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে 'বালক' 'ভীরু'— মনে হল, যেন
চারি দিকে হাসিতেছে সভাসদ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
দ্বারের প্রহরী, পশ্চাতে আছিল যারা
তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মতো
যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
তখন ভুলিয়া গেনু শিখেছিনু যত
শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য। কহিলাম রোষে,—
'কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া,
নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর। সেই খেদে
মোর রাজা কোষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।'
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি।
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

সুমিত্রা॥ ক্ষমা করো ভাই।

শংকর। এই কি উচিত তব? কাশ্মীরতনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমানকথা? বীরের স্বধর্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখো এ মিনতি।

সুমিত্রা। বোলো না, বোলো না আর
শংকর!— মার্জনা করো ভাই! পদতলে
পড়িলাম। ওই তব রুক্ষ কম্পমান

রোষানল নির্বাণ করিতে চাও? আছে
মোর হৃদয়শোণিত। মৌন কেন ভাই!
বাল্যকাল হতে আমি ভালোবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা।

শংকর ॥ শোনো প্রভু!

কুমার ॥ চুপ করো বৃদ্ধ। যাও তুমি, সৈন্যদের
জানাও আদেশ— এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে।

শংকর ॥ হায়, এ কী অপমান!
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি।

সুমিত্রা ॥ শংকর, বারেক তুই মনে করে দেখ—
সেই ছেলেবেলা। দুটি ছোটো ভাইবোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি?
প্রাণের সম্পর্ক এ যে চিরজীবনের—
পিতা-মাতা-বিধাতার আশীর্বাদে ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থখানি; বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণভূমি
শংকর, করিতে চাস অঙ্গারমলিন?

শংকর ॥ চলো দিদি, চলো ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল-মাঝে।

চতুর্থ দৃশ্য

বিক্রমদেবের শিবির

বিক্রমদেব, যুধাজিৎ ও জয়সেন

বিক্রমদেব ॥ পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্রধর্ম।

যুধাজিৎ ॥ পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রমদেব ॥ বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান—
আর শাস্তি কিবা?

যুধাজিৎ ॥ গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা?

জয়সেন ॥ চলো মহারাজ, চলো
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই— সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।

বিক্রমদেব ॥ তাই চলো।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা করি। কার্যস্রোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিনু; দেখি কোথা
গিয়া পড়ি, কোথা পাই কূল।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী ॥ মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ-তরে ব্রাহ্মণতনয়
দেবদত্ত।

বিক্রমদেব ॥ দেবদত্ত? নিয়ে এসো, নিয়ে
এসো তারে। না না, রোসো, থামো, ভেবে দেখি।
কী লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ? জানি তারে
ভালোমতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে
ফিরাতে আমারে। হায় বিপ্র, তোমরাই
ভাঙিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষ-মানা প্রাণীর মতন! চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম।
সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাকো; আমি ধেয়ে চলি
কার্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে, মত্ত
মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ,
মুহূর্ত তাহার পরমায়ু; তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ
মত্ত করিশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্ম-সম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল

জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।—
চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে।

জয়সেন॥ যে আদেশ।

যুধাজিৎ॥ (জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি)
ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু বলে।
বন্দী করে রাখো।

জয়সেন॥ বিলক্ষণ জানি তারে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর। প্রাসাদ

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী। যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধসজ্জা! শত্রু কোথা!
মিত্র আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো
তারে। করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন। রাজ্যরক্ষা-তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন? একি তব আপনার ধন?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে। তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্রসেন॥ চুপ করো, চুপ করো ;
বোলো না অমন করে। কর্তব্য আমার
করিব পালন ; তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কী করে।

রেবতী॥ তুমি কী করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর

চারি দিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্যসাধন।

চন্দ্রসেন ॥ ছি ছি রানী, এ-সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার 'পরে।
মনে হয়, সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি। আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
সন্দেহ জনমে। কর্তব্যের পথ হতে
ফিরায়ো না মোরে।

রেবতী ॥ আমিও পালিব তবে
কর্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ? অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো—
রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা,
ধিক্ বিড়ম্বনা! জেনো তুমি রাজভ্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ; সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে
রাজসভাপুত্তলিকা হয়ে। আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব— নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী ॥ যুবরাজ এসেছেন
রাজধানী-মাঝে। আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে।

প্রস্থান

রেবতী ॥ অন্তরালে রব
আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর-রাজপদে অপরাধীভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।

চন্দ্রসেন ॥ যেয়ো না চলিয়া।

রেবতী ॥ পারি নে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা
অসাধ্য আমার। তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে তোমাদের কথা।

প্রস্থান

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন ॥ প্রণাম!

সুমিত্রা ॥ প্রণাম তাত!

চন্দ্রসেন ॥ দীর্ঘজীবী হও।

কুমারসেন ॥ বহু পূর্বে পাঠায়েছি সংবাদ রাজন্,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই, রণসজ্জা কই!
কোথা সৈন্যবল!

চন্দ্রসেন ॥ শত্রুপক্ষ কারে বল ?

বিক্রম কি শত্রু হল ? জননী সুমিত্রা,

বিক্রম কি নহে বৎসে, কাশ্মীরজামাতা ?

সে যদি আসিল গৃহে এত কাল পরে,

অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ ?

সুমিত্রা ॥ হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা।

আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম

অন্তঃপুর ছাড়ি ! কোথা লুকাইয়া ছিল

এত অকল্যাণ ! অবলা নারীর ক্ষীণ

ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি

সর্প শতফণা। মোরে কিছু শুধায়ো না।

বুদ্ধিহীনা আমি।— তুমি সব জান ভাই।

তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে

মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,

আমি শুধু তোমারেই জানি।

কুমারসেন ॥ মহারাজ,

আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি ;

নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের

শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি।

অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,

কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ ?

চন্দ্রসেন ॥ সেজন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে

বল। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই

নাই।

কুমারসেন ॥ মোর হাতে দাও সৈন্যভার।

চন্দ্রসেন ॥ দেখা

যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ।
আবশ্যককালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী ॥ কে চাহিছে সৈন্যভার?

সুমিত্রা ও কুমারসেন ॥ প্রণাম জননী!

রেবতী ॥ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার? তুমি রাজপুত্র? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন? ছি ছি, লজ্জাহীন!
বনে গিয়ে থাকো লুকাইয়া। সিংহাসনে
বস যদি, বিশ্বশুদ্ধ সকলে দেখিবে—
কনককিরীটচূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত!

কুমারসেন ॥ জননী, কী অপরাধ করেছি চরণে!
কী কঠিন বচন তোমার! একি মাতা,
স্নেহের ভর্ৎসনা? বহু দিন হতে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার 'পরে। রোষদীপ্ত
দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্মস্থলে সদা;
কাছে গেলে চলে যাও কথা না কহিয়া
অন্য ঘরে; অকারণে কহ তীব্র বাণী।
বলো মাতা, কী করিলে আমারে তোমার
আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস।

রেবতী ॥ বলি তবে—

চন্দ্রসেন ॥ ছি ছি, চুপ করো রানী।

কুমারসেন ॥ মাতঃ,

অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়।

দ্বারে এল শত্রুদল আমারে করিতে

আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি।

রেবতী ॥ তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধীভাবে

জালন্ধর-রাজ-করে করিব অর্পণ।

মার্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন

বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

সুমিত্রা ॥ ধিক্ পাপ! চুপ করো মাতা। নারী হয়ে

রাজকার্যে দিয়ো না, দিয়ো না হাত। ঘোর

অমঙ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি,

আপনি পড়িবে। হেথা হতে চলো ফিরে

দয়ামায়াহীন ওই সদাঘূর্ণমান

কর্মচক্র ছাড়ি। তুমি শুধু ভালোবাসো,

শুধু স্নেহ করো, দয়া করো, সেবা করো—

জননী হইয়া থাকো প্রাসাদ-মাঝারে।

যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, রাজ্যরক্ষা— আমাদের কার্য

নহে।

কুমারসেন ॥ কাল যায়, মহারাজ— কী আদেশ?

চন্দ্রসেন ॥ বৎস, তুমি অনভিজ্ঞ, মনে কর তাই

শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য সিদ্ধ হয়

চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য মনে রেখো

সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্তের মাঝে!

কুমারসেন। নির্দয় বিলম্ব তব পিতঃ। বিপদের
মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থিরভাবে
বিচারমন্ত্রণা! প্রণাম, বিদায় হই।

সুমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান

চন্দ্রসেন। তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের 'পরে; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বেঁধে তারে রাখি বক্ষ-মাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাতবেদনা।

রেবতী। শিশু তুমি! মনে কর আঘাত না ক'রে
আপনি ভাঙিবে বাধা? পুরুষের মতো
যদি তুমি কার্যে দিতে হাত, আমি তবে
দয়ামায়া করিতাম ঘরে বসে বসে
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই।

প্রস্থান

চন্দ্রসেন। অতি-ইচ্ছা চলে অতি বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণপ্রাচীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর। হাট

লোকসমাগম

প্রথম ॥ কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে, আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ?

দ্বিতীয় ॥ না বেচলে কি আর রক্ষে আছে ? এ দিকে জালন্ধরের সৈন্য এল বলে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুয়েরই জায়গা থাকবে না।

মহাজন ॥ আচ্ছা ভাই, আমোদ করে নে। কিন্তু, শিগ্‌গির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাকতে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

প্রথম ॥ সেই সুখেই তো হাসছি বাবা। এবারে তোমায় আমায় এক সঙ্গে মরব। তুমি রাখতে গম জমিয়ে, আর আমি মরতুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুকনো মুখখানি দেখে যেন মরতে পারি।

দ্বিতীয় ॥ আমাদের ভাবনা কী ভাই ! আমাদের আছে কী ? প্রাণ-খানা এমনেও বেশিদিন টিঁকবে না, অমনেও বেশি দিন টিঁকবে না। এ ক'টা দিন কষে মজা করে নে রে ভাই।

প্রথম ॥ ও জনার্দন, এতগুলি থলে এনেছ কেন ? কিছু কিনবে নাকি ?

জনার্দন ॥ একেবারে বছরখানেকের মতো গম কিনে রাখব।

দ্বিতীয় ॥ কিনলে যেন, রাখবে কোথায় ?

জনার্দন ॥ আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্ছি।

প্রথম ॥ মামার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে তো! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে।

কোলাহল করিতে করিতে এক দল
লোকের প্রবেশ

পঞ্চম ॥ ওরে, কে তোরা লড়াই করতে চাস, আয়।

প্রথম ॥ রাজি আছি ; কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে।

পঞ্চম ॥ খুড়ো-রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড় করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

দ্বিতীয় ॥ বটে! খুড়ো-রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেকে ॥ আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষা করব।

পঞ্চম ॥ খুড়ো-রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী করতে চেষ্টা করেছিল, তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

প্রথম ॥ চল্ ভাই, খুড়ো-রাজাকে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি গে।

দ্বিতীয় ॥ চল্ ভাই, তার মুণ্ডুখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

পঞ্চম ॥ সে সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

প্রথম ॥ তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই শুরু করে দেওয়া যাক-না। প্রথমে ঐ মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুটে নেওয়া যাক। তার পরে ঘি আছে, চামড়া আছে, কাপড় আছে।

ষষ্ঠের প্রবেশ

ষষ্ঠ ॥ শুনেছিস? যুবরাজ লুকিয়েছেন শুনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে, যে তার সন্ধান বলে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে।

পঞ্চম ॥ তোর এসব খবরে কাজ কী?

দ্বিতীয় ॥ তুই পুরস্কার নিবি নাকি?

প্রথম ॥ আয়-না ভাই, ওকে সবাই মিলে পুরস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক। চুপ করে বসে থাকতে পারি নে।

ষষ্ঠ ॥ আমাকে মারিস নে ভাই, দোহাই বাপসকল! আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

দ্বিতীয় ॥ বেটা, তুই আপনি সাবধান হ।

পঞ্চম ॥ এ খবর যদি তুই রটাবি তা হলে তোর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

দূরে কোলাহল

অনেকে মিলিয়া ॥ এসেছে— এসেছে।

সকলে ॥ ওরে এসেছে রে, জালন্ধরের সৈন্য এসে পৌঁচেছে।

প্রথম ॥ তবে আর কী! এবারে লুঠ করতে চললুম। ঐ, জনার্দন থলে ভরে গোরুর পিঠে বোঝাই করছে। এই বেলা চল্। ঐ জনার্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকি ক'টা গোরু বোঝাইসুদ্ধ তাড়া করা যাক।

দ্বিতীয় ॥ তোরা যা ভাই। আমি তামাসা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখতে বড়ো মজা লাগে।

গান

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলেমেয়ে।
হরিবোল হরিবোল!
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা
মরণ-বাঁচন-অবহেলা—
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে

সুখ আছে কি মরার চেয়ে!
হরিবোল হরিবোল!
বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক—
কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।
হরিবোল হরিবোল!
রাজা প্রজা হবে জড়ো,
থাকবে না আর ছোটো বড়ো—
একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল হরিবোল!

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়। প্রাসাদ

অমরুরাজ ও কুমারসেন

অমরুরাজ ॥ পালাও, পালাও। এসো না আমার রাজ্যে।
আপনি মজিবে তুমি, আমারে মজাবে।
তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহি নে হইতে
অপরাধী জালন্ধর-রাজ-কাছে। হেথা
তব নাহি স্থান।

কুমারসেন ॥ আশ্রয় চাহি নে আমি।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার-মাঝে
ভাসাইব জীবনতরণী · · তার আগে
ইলারে দেখিয়া যাব একবার শুধু,
এই ভিক্ষা মাগি।

অমরুরাজ ॥ ইলারে দেখিয়া যাবে!
কী হইবে দেখে তারে? কী হইবে দেখা
দিয়ে? স্বার্থপর! রয়েছ মৃত্যুর মুখে
অপমান বহি— গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয়-মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি'

কুমারসেন ॥ কেন আসিয়াছি!
হায় আর্য, কেমনে তা বোঝাব তোমায়!

অমরুরাজ ॥ বিপদের খরস্রোতে ভেসে চলিয়াছ,
তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ

কুসুমিত তীরলতা! যাও, ভেসে যাও।

কুমারসেন॥ আমার বিপদ আজ দোঁহার বিপদ,
মোর দুঃখ দুজনের দুখ। প্রেম শুধু
সম্পদের নহে। মহারাজ, একবার
বিদায় লইতে দাও দু দণ্ডের তরে।

অমরুরাজ॥ চিরকালতরে-তুমি লয়েছ বিদায়।
আর নহে। যাও চলে। ভুলে যেতে, দাও
তারে অবসর; হাসিমুখখানি তার
দিয়ো না আঁধার করি এ জন্মের মতো।

কুমারসেন॥ ভুলিতে পারিত যদি দিতাম ভুলিতে।
ফিরে এসে দেখা দিব, বলে গিয়েছিনু;
জানি সে রয়েছে বসি আমার লাগিয়া
পথ-পানে চাহি, আমারে বিশ্বাস করি'।
সে সরল সে অগাধ বিশ্বাস তাহার—
কেমনে ভাঙিতে দিব!

অমরুরাজ॥ সে বিশ্বাস ভেঙে
যাক একবার। নতুবা নূতন পথে
জীবন তাহার ফিরাতে সে পারিবে না।
চিরকাল দুঃখতাপ চেয়ে কিছুকাল
এ যন্ত্রণা ভালো।

কুমারসেন॥ তার সুখদুঃখ তুমি
দিয়েছ আমার হাতে, কিছুতে ফিরায়ে
নিতে পারিবে না আর। তারে তুমি আর
নাহি জান। তারে আর নারিবে বুঝিতে।

তুমি যারে সুখদুঃখ ব'লে মনে কর
তার সুখদুঃখ তাহা নহে। একবার
দেখে যাই তারে।

অমরুরাজ। আমি তারে জানায়েছি,
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্যাদায়
ক্ষুদ্র ব'লে আমাদের অবহেলা করে—
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
বিবাহ ভাঙিতে।

কুমারসেন। ধিক্, ধিক্ প্রতারণা!
সরল বালিকা সে কি তোমার দুহিতা!
এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল! শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙে! এখনো সে বেঁচে
রয়েছে, কি! যেতে দাও, যেতে দাও মোরে—
দিবে না কি যেতে? হানো তবে তরবারি—
বোলো তারে মরে গেছি আমি। প্রতারণা
কোরো না তাহারে।

শংকরের প্রবেশ

শংকর। আসিছে সন্ধানে তব
শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ। এইবেলা
চলো যাই।

কুমারসেন। কোথা যাব? কী হবে লুকায়ে?
এ জীবন পারি নে বহিতে।

শংকর ॥ বনপ্রান্তে
তোমার অপেক্ষা করি আছেন সুমিত্রা।

কুমারসেন ॥ চলো, যাই চলো। ইলা, কোথা আছ ইলা!
ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া। দুর্ভাগ্যের
দিনে, জগতের চারি দিকে রুদ্ধ হয়
আনন্দের দ্বার। প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি,
তাই বলে নহি অবিশ্বাসী— চলো, যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিচূড়। অন্তঃপুর

ইলা ও সখীগণ

ইলা। মিছে কথা, মিছে কথা! তোরা চুপ কর্।
আমি তার মন জানি। সখী, ভালো করে
বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে।
নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর। স্বর্ণথালে
আন্ তুলে শুভ্র শুভ্র মালতীর ফুল।
নির্ঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা
ভালো সে বাসিত, ওইখানে শিলাতলে
পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
প্রতিদিন করি সাজ, এমনি করিয়া
প্রতিদিন থাকি বসে— কে জানে কখন
সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর।
এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
পরে পরে দুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত
গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি,
এবার পূর্ণিমানিশি হবে না নিষ্ফল।
আসিবে সে দেখা দিতে। না'ই যদি আসে
তোদের কী! আমারে সে ভুলে যায় যদি
আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা
না ভুলিবে, কী আছে আমার! ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভালো— ভালোবেসে যদি

সুখী হয় সেও ভালো। তোরা সখী, মিছে
বকিস নে আর। একটুকু চুপ কর্‌।

গান

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসর-মতো বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখ-পানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধু-পবনে
চির- বিকশিত বনভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী—
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো।

পঞ্চম দৃশ্য

কাশ্মীর। শিবির

বিক্রমদেব, জয়সেন ও যুধাজিৎ

জয়সেন ॥ কোথায় সে পালাবে রাজন্! ধরে এনে
দিব তারে রাজপদে। বিবরদুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর গিরি
লাগাব আগুন; আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রমদেব ॥ এতদূর এনু পিছে পিছে— কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙি,
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে! চাহি তারে,
চাহি তারে আমি। সে না হলে সুখ নাই,
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে,
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড খণ্ড করি
দেখিব কোথা সে আছে।

যুধাজিৎ ॥ ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা।

বিক্রমদেব ॥ তারে পেলে
অন্য কার্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া, শূন্যপ্রায় রাজকোষ,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজ্য অরাজক দেশে—
ফিরিতে পারি নে তবু। এ কী দৃঢ়পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক!

সচকিতে সদা মনে হয়— এই এল,
এই এল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধুলা, আর দেরি নাই, এইবার
বুঝি পাব তারে ধাবমান ঘনশ্বাস
ত্রস্ত-আঁখি মৃগসম। শীঘ্র আনো তারে
জীবিত কি মৃত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক
মায়াপাশ। নতুবা যা কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার
তরে।

বিক্রমদেব। তোমরা সরিয়া যাও।

প্রহরীকে

নিয়ে এসো
তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।

অন্য সকলের প্রস্থান

কী বিপদ!
আসিছেন শাশুড়ি আমার। কী বলিব
শুধাইলে কুমারের কথা! কী বলিব
মার্জনা চাহেন যদি যুবরাজ-তরে!
সহিতে পারি নে আমি অশ্রু রমণীর।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ

প্রণাম! প্রণাম আর্যা!

চন্দ্রসেন ॥ চিরজীবী হও।

রেবতী ॥ জয়ী হও, পূর্ণ হোক মনস্কাম তব।

চন্দ্রসেন ॥ শুনেছি তোমার কাছে কুমার হয়েছে
অপরাধী।

বিক্রমদেব ॥ অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্রসেন ॥ বিচারে কী শাস্তি তার করেছ বিধান ?

বিক্রমদেব ॥ বন্দীভাবে অপমান করিলে স্বীকার,
করিব মার্জনা।

রেবতী ॥ এই শুধু ? আর কিছু
নয় ? অবশেষে মার্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা !

বিক্রমদেব ॥ ভৎসনা কোরো না মোরে।
রাজার প্রধান কাজ আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহিছে
অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসি নি হেথায়।

চন্দ্রসেন ॥ ক্ষমা তারে করো বৎস—
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত, কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্বাসন সেও
ভালো, প্রাণে বধিয়ো না।

বিক্রমদেব ॥ চাহি না বধিতে।

রেবতী ॥ তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া ?

এত অসি শর? নির্দোষী সৈনিকদের
বধ করে যাবে, যথার্থ যে জন দোষী
ক্ষমিবে তাহারে?

বিক্রমদেব॥ বুঝিতে পারি না দেবী,
কী বলিছ তুমি।

চন্দ্রসেন॥ কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার— আমি তারে
কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর,
তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। অসন্তুষ্ট
মহারানী তাই; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি
করিছে প্রার্থনা তোমা-কাছে। গুরুদণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।

বিক্রমদেব॥ আগে তারে বন্দী করে আনি। তার পরে
যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেবতী॥ প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে; আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো
ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।

চন্দ্রসেন॥ চুপ করো, চুপ করো রানী। চলো বৎস,
শিবির ছাড়িয়া চলো কাশ্মীরপ্রাসাদে।

বিক্রমদেব ॥ পরে যাব, অগ্রসর হও মহারাজ।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান

ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নিশিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এত দিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে।
অমনি শাণিত ক্রূর বক্র জ্বালারেখা
আছে কি ললাটে মোর! রুদ্ধ হিংসাভারে
অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে!
অমনি কি তীক্ষ্ণ মোর উষ্ণ তিক্ত বাণী
খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষমাখা।
নহে নহে, কভু নহে। এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মতো প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী, সর্বগ্রাসী, উদ্দাম, উন্মাদ,
দুর্নিবার। নহি আমি তোদের আত্মীয়।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা।
এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও,
নিবাও এ চিতা। পিশাচ-পিশাচী যত
অতৃপ্তহৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা
ফিরে যাক রুদ্ধ রোষে, লালায়িত লোভে।
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিবারণ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা।

দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
আপনি জ্বলিয়া মরে নরবিষধর !
রমণীর হিংস্র মুখ সূচিময় যেন—
কী ভীষণ ! কী নিষ্ঠুর ! একান্ত কুৎসিত !

চরের প্রবেশ

চর ॥ ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার ।

বিক্রমদেব ॥ এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে । একা আমি
যাব সেথা মৃগয়ার ছলে ।

চর ॥ যে আদেশ ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অরণ্য

শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমারসেন শয়ান

সুমিত্রা আসীন

কুমারসেন ॥ কত রাত্রি ?

সুমিত্রা ॥ রাত্রি আর নাই ভাই। রাঙা
হয়ে উঠেছে আকাশ। শুধু বনচ্ছায়া
অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে।

কুমারসেন ॥ সারা রাত্রি
জেগে বসে আছ বোন, ঘুম নেই চোখে ?

সুমিত্রা ॥ জাগিয়াছি দুঃস্বপন দেখে। সারা রাত
মনে হয়, শুনি যেন পদশব্দ কার
শুষ্ক পল্লবের 'পরে। তরু-অন্তরালে
শুনি যেন কাহাদের চুপিচুপি কথা,
বিজন মন্ত্রণা। শ্রান্ত আঁখি যদি কভু
মুদে আসে, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
জেগে উঠি। সুখসুপ্ত মুখখানি তব
দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে।

কুমারসেন ॥ দুর্ভাবনা
দুঃস্বপ্নজননী। ভেবো না আমার তরে
বোন। সুখে আছি। মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ।

মরণের তটপ্রান্তে ব'সে এ যেন গো
প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।
এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত
প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন
আমারে করিছে আলিঙ্গন। জীবনের
প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
আমি পেতেছি আস্বাদ। ঘন বন,
তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
নির্ঝরিণী— আশ্চর্য এ শোভা। অযাচিত
ভালোবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টি-সম
অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারি দিকে
ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
জীবনবিহঙ্গ বিচিত্রবরন পাখা
করিছে বিস্তার। ওই শোনো কাঠুরিয়া
গান গায়— শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে।
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে।

কুমারসেন ॥ (অগ্রসর হইয়া)

বন্ধু, আজি কী সংবাদ ?

কাঠুরিয়া ॥ ভালো নয় প্রভু।

জয়সেন কাল রাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে

নন্দীগ্রাম ; আজ আসে পাণ্ডুপুর-পানে।

কুমারসেন ॥ হায় ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের

রক্ষা করি ! ভগবান, নির্দয় কেন গো

নির্দোষ দীনের 'পরে !

কাঠুরিয়া ॥ (সুমিত্রার প্রতি) জননী, এনেছি

কাষ্ঠভার— রাখি শ্রীচরণে।

সুমিত্রা ॥ বেঁচে থাকো।

কাঠুরিয়ার প্রস্থান

মধুজীবীর প্রবেশ

কুমারসেন ॥ কী সংবাদ ?

মধুজীবী ॥ সাবধানে থেকো যুবরাজ।

তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত

পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে

যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু।

কুমারসেন ॥ বিশ্বাস করিয়া মরা ভালো— অবিশ্বাস

কাহারে করিব ? তোরা সব অনুরক্ত

বন্ধু মোর সরলহৃদয়।

মধুজীবী ॥ মা-জননী,

এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু—

দয়া করে করো মা, গ্রহণ।

স্থমিত্রা ॥ ভগবান

মঙ্গল করুন তোর।

মধুজীবীর প্রস্থান

শিকারীর প্রবেশ

শিকারী ॥ জয় হোক প্রভু।

ছাগশিকারের তরে যেতে হবে দূর

গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে

প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ

মোর দিয়াছে জ্বালায়ে।

কুমারসেন ॥ ধিক্ সে পিশাচ!

শিকারী ॥ আমরা শিকারী। যত দিন বন আছে

আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?

কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের

তুচ্ছ উপহার। আশীর্বাদ করো যেন

ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি

সিংহাসনে।

কুমারসেন ॥ (বাহু বাড়াইয়া)

এসো তুমি, এসো আলিঙ্গনে।

শিকারীর প্রস্থান

ওই দেখো পল্লব ভেদিয়া পড়িতেছে

রবিকররেখা। যাই নির্ঝরের ধারে,

স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন। শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয়।
নদী হয়ে গেছে চলে এই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড়প্রমোদবন দিয়ে। ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে, যেথা সেই
সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে তীরতরুতলে
ইলা— তার ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে।
থাক্ থাক্ কল্পনা, স্বপন। চলো বোন,
যাই নিত্য কাজে। ওই শোনো চারি দিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে।

সপ্তম দৃশ্য

ত্রিচূড়। প্রমোদবন

বিক্রমদেব ও অমরুরাজ

অমরুরাজ ॥ তোমারে করিনু সমর্পণ যাহা আছে
মোর। তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ।
তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহো তুমি।
সহকার মাধবিকা-লতার আশ্রয়।
ক্ষণেক বিলম্ব করো মহারাজ, তারে
দিই পাঠাইয়া।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ কী মধুর শান্তি হেথা!
চিরন্তন অরণ্য-আবাস, সুখসুপ্ত
ঘনচ্ছায়া, নির্ঝরিণী নিরন্তরধ্বনি।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল
উদাস সমুদ্রসম— বহু দিন ভুলে
ছিনু যেন। মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনলদাহ, সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দেশ—
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা!
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের—
গেল কার অপরাধে! আমার কি তার!
যারই হোক— এ জনমে আর কি পাব না?

যাও তবে— একেবারে চলে যাও দূরে।
জীবনে থেকো না জেগে অনুতাপরূপে।
দেখা যাক যদি এইখানে— সংসারের
নির্জন নেপথ্যদেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর।

সখীর সহিত ইলার প্রবেশ

এ কী অপরূপ মূর্তি! চরিতার্থ আমি!
আসন গ্রহণ করো দেবী! কেন মৌন,
নতশির! কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর! কিসের বেদনা তব?

ইলা ॥ (নতজানু)

শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি,
সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে।

বিক্রমদেব ॥ উঠ উঠ হে সুন্দরী!

তব পদস্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী—
তুমি কেন ধুলায় পতিত! চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে!

ইলা ॥ মহারাজ,

পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ
আছে তব; ফেলে রেখে যাও মোরে এই

ভূমিতলে। তোমার অভাব কিছু নাই।

বিক্রমদেব ॥ আমার অভাব নাই! কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়! কোথা সেথা ধনরত্ন!
কোথা সসাগরা ধরা! সব শূন্যময়।
রাজ্যধন না থাকিত যদি— শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

ইলা ॥ (উঠিয়া) লহো তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও।

বিক্রমদেব ॥ কেন দেবী, মোর 'পরে এত
অবহেলা? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি? এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জয়,
প্রার্থনা করেও আমি পাব না। কি তবু
হৃদয় তোমার?

ইলা ॥ সে কি আর আছে মোর?
সমস্ত সঁপেছি যারে বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কত দিন হল; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো। পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়—

আর যদি ফিরিয়া না আসে! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে! রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

বিক্রমদেব ॥ না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান! সাবধান, অতি প্রেম
সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা।
এক কালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালোবাসিতাম। সে প্রেমের 'পরে
পড়িল বিধির হিংসা— জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে।
বসে আছ যার তরে কী নাম তাহার?

ইলা ॥ কাশ্মীরের যুবরাজ— কুমার তাহার
নাম।

বিক্রমদেব ॥ কুমার!

ইলা ॥ তারে জান তুমি! কেই বা
না জানে! সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয়।

বিক্রমদেব ॥ কুমার! কাশ্মীরের যুবরাজ!

ইলা ॥ সেই বটে মহারাজ। তার নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে। তোমারি সে বন্ধু বুঝি!
মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রমদেব ॥ তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড়ো তার আশা। শিকারের মৃগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন—

গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে।

ইলা ॥ কী বলিলে মহারাজ!

বিক্রমদেব ॥ তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্তভাগে,
শুধু ভালোবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার, কর্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায়— ছলছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক। বৃথা তার আশা।

ইলা ॥ সত্য বলো মহারাজ, ছলনা কোরো না।
জেনো এই অতিক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বন-মাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার। আমি যাব,
বলে দাও— গৃহ ছেড়ে কখনো যাই নি—
কোথা যেতে হবে। কোন্ দিকে, কোন্ পথে!

বিক্রমদেব ॥ বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার।

ইলা ॥ তোমরা কি বন্ধু নহ?
তোমরা কি কেহ রক্ষা করিবে না তারে?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া? এতটুকু
দয়া নেই কারো! প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি তো জানি নে নাথ, সংকটে পড়েছ—

আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুৎসম বেজেছে সংশয়।
শুনেছিনু এত লোক ভালোবাসে তারে,
কোথা তারা বিপদের দিনে! তুমি নাকি
পৃথিবীর রাজা। বিপন্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে? তবে, পথ বলে দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী।

বিক্রমদেব॥ কী প্রবল প্রেম! ভালোবাসো, ভালোবাসো
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব!
আমারে বিশ্বাস করো— আমি বন্ধু তব।
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব;
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী।

ইলা॥ মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে। কোথা যেতে বল, যাব।

বিক্রমদেব॥ এসো তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী-মাঝে।

ইলা ও সখীগণের প্রস্থান

যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি-সম; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে ব'হে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল!
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী ॥ ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে।

বিক্রমদেব ॥ নিয়ে এসো, দেখা যাক।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ॥ রাজার দোহাই, ব্রাহ্মণেরে রক্ষা করো।

বিক্রমদেব ॥ একি! তুমি কোথা হতে এলে! অনুকূল
দৈব মোর 'পরে! তুমি বন্ধুরত্ন মোর!

দেবদত্ত ॥ তাই বটে মহারাজ, রত্ন বটে আমি!
অতি যত্নে বন্ধ করে রেখেছিলে তাই।
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার।
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে। আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি। সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর!

বিক্রমদেব ॥ একি কথা!
আমি তো জানি নে কিছু, এতদিন রুদ্ধ
আছ তুমি!

দেবদত্ত ॥ তুমি কী জানিবে মহারাজ!
তোমার প্রহরী দুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে
মূর্খদুটো হাসে! একদিন বর্ষা দেখে
বিরহব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে; গ্রাম্য মূর্খদুটো
পড়িল কাতর হয়ে নিদ্রার আবেশে।
তখনি ধিক্কারভরে কারাগার ছাড়ি
আসিনু চলিয়া। বেছে বেছে ভালো লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের 'পরে!
এত লোক আছে সখা, অধীনে তোমার—
শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দুজন?

বিক্রমদেব ॥ বন্ধুবর, বড়ো কষ্ট দিয়েছে তোমারে।
সমুচিত শাস্তি দিব তারে যে পাষণ্ড

রেখেছিল রুধিয়া তোমায়! নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন।

দেবদত্ত ॥ শাস্তি পরে হবে।
আপাতত, যুদ্ধ রেখে অবিলম্বে দেশে
ফিরে চলো। সত্য কথা বলি মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয়, এবার তা
পেরেছি বুঝিতে। আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড়ো বড়ো লোক বিরহেতে মরে।
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ— ছোটো
বড়ো করে না বিচার।

বিক্রমদেব ॥ যম আর প্রেম
উভয়েরই সমদৃষ্টি সর্বভূতে। বন্ধু,
ফিরে চলো দেশে। কেবল যাবার আগে
এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহো ভার।
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
সখে, তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে,
আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে
বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে।
আর, সখা— আর-কেহ যদি থাকে সেথা—
যদি দেখা পাও আর-কারো—

দেবদত্ত ॥ জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত।

এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে ক'রে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা।
চলিলাম তবে।

বিক্রমদেব ॥ বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণপবন, তার পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে,
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখভার।

অষ্টম দৃশ্য

অরণ্য

কুমারের দুইজন অনুচর

প্রথম ॥ হ্যা-দেখ্‌, মাধু, কাল যে স্বপ্নটা দেখলুম তার কোনো মানে ভেবে পাচ্ছি নে। শহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয় ॥ কী স্বপ্নটা বল্‌ তো শুনি।

প্রথম ॥ যেন একজন মহাপুরুষ ঐ জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড়ো বড়ো বেল দিতে এল। আমি দুটো দু হাতে নিলুম, আর-একটা কোথায় নেব ভাবনা পড়ে গেল।

দ্বিতীয় ॥ দূর মূর্খ, তিনটেই চাদরে বেঁধে নিতে হয়।

প্রথম ॥ আরে, জেগে থাকলে তো সকলেরই বুদ্ধি জোগায়— সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পরে শোন্‌-না, সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ করলে, আমি তার পিছন পিছন ছুটলুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আহ্নিক করছেন। বেলটা ধপ করে তাঁর কোলের উপর গিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দ্বিতীয় ॥ এটা আর বুঝতে পারলি নে? যুবরাজ শিগ্‌গির রাজা হবে।

প্রথম ॥ আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে দুটো বেল পেলুম, আমার কী হবে?

দ্বিতীয় ॥ তোর আবার হবে কী! তোর খেতে বেগুন বেশি করে ফলবে।

প্রথম॥ না ভাই, আমি ঠাউরে রেখেছি, আমার দুই পুত্তুর-সন্তান হবে।

দ্বিতীয়॥ স্থা-দেখ্ ভাই, বললে পিত্তয় যাবি নে, কাল ভারী আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ঐ জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম, তা আমি কথায় কথায় বললুম, আমাদের দোবেজি গুনে বলেছে, যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে, আর দেরি নেই—এবার শিগ্গির রাজা হবে। হঠাৎ মাথার উপর কে তিনবার বলে উঠল 'ঠিক ঠিক ঠিক'; উপরে চেয়ে দেখি, ডুমুরের ডালে এতবড়ো একটা টিকটিকি!

রামচরণের প্রবেশ

প্রথম॥ কী খবর রামচরণ?

রামচরণ॥ ওরে ভাই, আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিজ্ঞেসা করলে। আমি তেমনি বোকা আর-কি? আমিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগলুম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আস্ত রাখতুম না।

দ্বিতীয়॥ কিন্তু, তা হলে তো এ বন ছাড়তে হচ্ছে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখছি।

প্রথম॥ এইখানে বসে পড়ো-না ভাই রামচরণ, দুটো গল্প করা যাক।

রামচরণ॥ যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মাঠাকরুন এই দিকে আসছেন। চল্ ভাই, তফাতে গিয়ে বসি গে।

প্রস্থান

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন ॥ শংকর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ
নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া
ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন-কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তার 'পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তারা
পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির।

সুমিত্রা ॥ হায় বৃদ্ধ, প্রভুবৎসল! প্রাণাধিক
ভালোবাস যারে সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ!

কুমারসেন ॥ এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতি বৃদ্ধ, ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা! আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া।

সুমিত্রা ॥ আমি যাই
ভাই! ভিখারিনীবেশে সিংহাসনতলে
গিয়া, শংকরের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি!

কুমারসেন ॥ বাহির হইতে তারা আবার তোমারে
দিবে ফিরাইয়া। তোমার পিতার রাজ্য
হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে
মর্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ

চর ॥ গত রাত্রে গিধ্‌কূট
জ্বালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন
গ্রামবাসীগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর-অরণ্য-মাঝে।

প্রস্থান

কুমারসেন ॥ আর তো সহে না।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রা ॥ চলো,
মোরা দুই জনে যাই রাজসভা-মাঝে।
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব।

কুমারসেন ॥ শংকর বলিত,
'প্রাণ যায় সেও ভালো, তবু বন্দীভাবে
কখনো দিয়ো না ধরা।' পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি— একি সহ্য হবে!
অনেক সহেছি বোন, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে!

সুমিত্রা ॥ তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন ॥ বলো বোন, বলো, 'তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো!' এই তো তোমার যোগ্য কথা।

তার চেয়ে মৃত্যু ভালো! ভালো করে ভেবে
দেখো। বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল। বলো,
একি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ-আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোলো, স্পষ্ট করে বলো একবার—
ঘৃণিত এ প্রাণ লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা, এক দণ্ড একি
উচিত আমার?

সুমিত্রা ॥ ভাই—

কুমারসেন ॥ আমি রাজপুত্র—
ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা, কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী,
তবু আমি কোনোমতে বাঁচিব গোপনে?

সুমিত্রা ॥ তার চেয়ে মৃত্যু ভালো!

কুমারসেন ॥ বলো, তাই বলো।
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর— প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ— একি বেঁচে থাকা!

সুমিত্রা ॥ এর চেয়ে মৃত্যু ভালো!

কুমারসেন ॥ বাঁচিলাম শুনে।
কোনোমতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর

নির্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন,
যতই কঠিন হোক।

সুমিত্রা ॥ করিনু শপথ।

কুমারসেন ॥ এ জীবন দিব বিসর্জন। তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে
জালন্ধর-রাজ-করে দিবে উপহার।
বলিয়ো তাহারে, 'কাশ্মীরে অতিথি তুমি;
ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে।'
মৌন কেন বোন? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার? বোসো এই তরুতলে।
পারিবে না তুমি? একান্ত অসাধ্য এ কি?
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ-উপহার-সম এ রাজমস্তক।
সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবে যে রোষে
ছিন্নভিন্ন করি।

সুমিত্রার মূর্ছা।

ছি ছি, বোন! উঠ, উঠ!
পাষাণে হৃদয় বাঁধো। হোয়ো না বিহ্বল।
দুঃসহ এ কাজ— তাই তো তোমার 'পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,

মহৎ-হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত! বলো বোন,
পারিবে করিতে?

সুমিত্রা॥ পারিব।

কুমারসেন॥ দাঁড়াও তবে।
ধরো বল, তোলো শির। উঠাও জাগায়ে
সমস্ত হৃদয় মন। ক্ষুদ্র নারীসম
আপন বেদনাভারে পোড়ো না ভাঙিয়া।

সুমিত্রা॥ অভাগিনী ইলা!

কুমারসেন॥ তারে কি জানি নে আমি?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত! সে আমার ধ্রুবতারা,
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত।
জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে
চিরমিলনের বেশ করিব ধারণ।
চলো বোন। আগে হতে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভা-মাঝে, কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে
শংকর পাইবে ছাড়া— বান্ধব আমার।

নবম দৃশ্য

কাশ্মীর। রাজসভা

বিক্রমদেব ও চন্দ্রসেন

বিক্রমদেব ॥ আর্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন?
মার্জনা তো করেছি কুমারে।

চন্দ্রসেন ॥ তুমি তারে
মার্জনা করেছ। আমি তো এখনো তার
বিচার করি নি। বিদ্রোহী সে মোর কাছে।
এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রমদেব ॥ কোন্ শাস্তি
করিয়াছ স্থির?

চন্দ্রসেন ॥ সিংহাসন হতে তারে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রমদেব ॥ অতি অসম্ভব কথা।
সিংহাসন দিব তারে নিজহস্তে আমি।

চন্দ্রসেন ॥ কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কী আছে
অধিকার?

বিক্রমদেব ॥ বিজয়ীর অধিকার।

চন্দ্রসেন ॥ তুমি
হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মতো।
কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।

বিক্রমদেব ॥ বিনা যুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও যুদ্ধ করো,

রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন।
যারে ইচ্ছা দিব।

চন্দ্রসেন ॥ তুমি দিবে! জানি আমি
গর্বিত কুমারসেনে জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে? প্রেম দাও প্রেম লবে,
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে।

বিক্রমদেব ॥ এত গর্ব যদি তার তবে সে কি কভু
ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত?

চন্দ্রসেন ॥ তাই ভাবিতেছি— মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মতো কাজ। দৃপ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে! জীবনের মায়া
এতই কি বলবান!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী ॥ শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।

বিক্রমদেব ॥ শিবিকার দ্বার রুদ্ধ?

চন্দ্রসেন ॥ সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ! আপনার পিতৃরাজ্যে
আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে— রাজপথে
লোকারণ্য, চারি দিকে সহস্রের আঁখি

রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীরললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে।
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন, পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ। কোন্ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে? মহারাজ, শোনো
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও।
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার।
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে ভাবিবে সে,
নিশীথতিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
তাই এত আলো। এ আলোক শুধু বুঝি
অপমান-পিশাচের পরিহাস-হাসি।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ॥ জয়োস্তু রাজন্! কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে ফিরিয়াছি, পাই নাই দেখা।
আজ শুনিলাম নাকি আসিছেন তিনি
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এনু।

বিক্রমদেব ॥ করিব রাজার মতো অভ্যর্থনা তারে।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেককালে।
পূর্ণিমানিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

সকলে ॥ মহারাজ, জয় হোক।

প্রথম ॥ করি

আশীর্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও।

লক্ষ্মী হোন অচলা তোমার গৃহে সদা।

আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে

বলিতে শকতি নাই— লহো মহারাজ,

কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ-আশিস্।

রাজার মস্তকে ধান্যদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ

বিক্রমদেব ॥ ধন্য আমি, কৃতার্থ জীবন।

ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান

যষ্টিহস্তে কষ্টে শংকরের প্রবেশ

শংকর ॥ (চন্দ্রসেনের প্রতি) মহারাজ,

একি সত্য ? যুবরাজ আসিছেন নিজে

শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ !

বলো, একি সত্য কথা ?

চন্দ্রসেন ॥ সত্য বটে।

শংকর ॥ ধিক্,

সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্।

হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব—

সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি

চূর্ণ হয়ে গেল, মূকসম রহিলাম

তবু, সে কি এরি তরে ! অবশেষে তুমি

আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নতশিরে
বন্দীশালা-মাঝে! এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের! যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্বোচ্চ শিখরে
সে আজ তোমার কাছে ধরার ধুলার
চেয়ে নীচে! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
গৃহতুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জ্বল,
কঠিন পর্বতশৃঙ্গ— অনুর্বর মরু—
রাজার সম্পদে পূর্ণ। চিরভৃত্য তব
আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন!

বিক্রমদেব। ভালো হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
এ তব ক্রন্দন।

শংকর। রাজন্, তোমার কাছে
আসি নি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন-কাছে;
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানতশির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয়বেদনা।

বিক্রমদেব। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ ভ্রম?
মিত্র আমি আজি।

শংকর। অতিশয় দয়া তব
জালন্ধর-পতি! মার্জনা করেছ তুমি!
দণ্ড ভালো মার্জনার চেয়ে।

বিক্রমদেব। এর মতো

হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে!

দেবদত্ত ॥ আছে বন্ধু, আছে মহারাজ।

বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল

শংকরের দুই হস্তে মুখ-আচ্ছাদন

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী ॥ আসিয়াছে

দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রমদেব ॥ বাদ্য কোথা, বাজাইতে

বলো। চলো সখা, অগ্রসর হয়ে তারে

অভ্যর্থনা করি।

বাদ্যোদ্যম

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ

বিক্রমদেব ॥ (অগ্রসর হইয়া) এসো এসো, বন্ধু, এসো!

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া

সুমিত্রার শিবিকা-বাহিরে আগমন

সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব

বিক্রমদেব ॥ সুমিত্রা! সুমিত্রা।

চন্দ্রসেন ॥ একি! জননী সুমিত্রা!

সুমিত্রা ॥ ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে

কাননে কান্তারে শৈলে— রাজ্য ধর্ম দয়া

রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি

দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,

মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
নহো মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি!

উচ্চস্বরে

মা গো জগৎ জননী,
দয়াময়ী, স্থান দাও কোলে।

পতন ও মৃত্যু

ছুটিয়া ইলা'র প্রবেশ

ইলা। একি। একি!
মহারাজ, কুমার আমার—

মৃত।

শংকর। (অগ্রসর হইয়া) প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজার মতো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল। এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে। গেছ তুমি

পুণ্যধামে— ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে।

চন্দ্রসেন ॥ (মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া)
ধিক্ এ মুকুট !
ধিক্ এই সিংহাসনে !

সিংহাসনে পদাঘাত

রেবতীর প্রবেশ

রাক্ষসী, পিশাচী,
দূর হ, দূর হ— আমারে দিস নে দেখা,
পাপীয়সী !

রেবতী ॥ এ রোষ রবে না চিরদিন।

প্রস্থান

বিক্রমদেব ॥ (নতজানু)
দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না ? রেখে
গেলে চির-অপরাধী ক'রে ? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব ; তাহারো দিলে না অবকাশ ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

—